ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্তঃশীলা–আবর্ত–মোহনা : ভাবাদর্শের প্রতিসন্দর্ভ

> "*Ideology is both a real and an imaginary relation to the world – real in that in the way in which people really like their relationship to the social relations which govern their condition existence but imaginary in that is discourages a full understanding of these conditions of existence and the ways in which people we socially constituted within them*"[১]

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা – এই ত্রয়ীটি বুদ্ধিবাদী ধূর্জটিপ্রসাদের একমাত্র ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। তিনি একজন ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ। শিক্ষায়, চিন্তায়, ভাবনায়, বিশ্বাসে এই প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব এক নতুন আদলে উপন্যাসের ভাবনাকেই পাল্টে দিলেন। বুদ্ধিবাদী, যুক্তিবাদী ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যে নতুন আঙ্গিকে ভাবনা এবং আবেগের পরিবর্তেই চিন্তাশ্রয়ী উপন্যাসের সূচনা করেন। অনেকেরই বক্তব্য ধূর্জটিপ্রসাদের এই রচনায় প্রত্যেক সচেতন পাঠককে প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে হয়।

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা – এই উপন্যাস ত্রয়ীতে একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী, যুক্তিবাদী, মননশীল মানুষ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভুবন থেকে জীবনের বিভিন্ন আবর্তের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনে মোহানায় পৌঁছেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, খগেনবাবুকে তিনি মন ধার দিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যে খগেন এবং ধূর্জটিপ্রসাদ বাস্তবে একাত্মসত্তা নয়। চিন্তাশীল ব্যতিক্রমী ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং কল্পনার মিশ্রণে গঠিত ভাবাদর্শ খগেন নামক চরিত্র বহন করে নিয়ে গেছে। 'শ্রীকান্ত' বা 'ত্রিদিবা'য় আমরা কোনও কোনও জায়গায় লেখক এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল কখনও কখনও খুঁজে পাই। কিন্তু সচেতন বুদ্ধিশীল ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনে কখনও ধরা দেননি। শুধু জ্ঞান অর্জনের

স্পৃহা, গভীর অধ্যয়নে, নিজের অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে, নিজস্ব একটি বিশ্বাসের জায়গায় আমরা তাদের স্থির থাকতে দেখি। ব্যক্তিজীবনে যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিক তেমনি তার মন ধার দেওয়া খগেনবাবু এর ব্যতিক্রম নন।

ধূর্জটিপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলাপ্রসাদ অন্তঃশীলার স্পষ্টীকরণে একটি চিঠিতে লিখেছেন–

> *" 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে আত্মজীবনের কোনো ছাপ আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, নায়ক খগেনকে অনেকে ধূর্জটিপ্রসাদের 'photo type' বলে মনে করেন। খগেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ। লেখক এবং আমরা অনেকেও তাই। কাজেই ঐরকম ধারণা অমুলক নয়। তবে বইয়ের মধ্যে যেসব দৃশ্য বা ঘটনার উল্লেখ বা বর্ণনা আছে, সেগুলিতে তাঁর নিজ জীবনের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে বলে মনে করি না। তবে এক্ষেত্রে নিজের দেখা বা বর্হিজীবনের কোনো কোনো অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যা তিনি উপকরণ হিসাবে হয়ত ব্যবহার করেছেন। বাকিটা অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনার ব্যাপার।"*[২]

আত্মজীবনীর মধ্যে তো বিশ্বাস এবং অনভূতির জায়গা থাকতে পারে। যা আমরা দেখতে পাই ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানার মধ্যে। এখানে আত্মজীবনের উপকরণ বলতে তার জ্ঞানার্জিত উপলব্ধি, বিশ্বাস এবং ভাবাদর্শকে চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেছেন খগেনবাবুর মধ্য দিয়ে। খগেনবাবু এবং ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্বাসের ভুবন আসলে এক। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজের বিশ্বাসের জায়গাটাকে সম্প্রসারিত করে গেছেন খগেনবাবুকে আধার করে। তাই ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের উপকরণের ছায়াঞ্চলে আত্মজীবনের ছায়া পড়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। যা একক ব্যক্তি খগেনবাবু এবং ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবাদর্শের সম্মিলনে গঠিত। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা, আত্মজীবনের বিশ্বাস সমৃদ্ধ উপন্যাস। যেখানে ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং কল্পনার মিশ্রণে ভাবাদর্শের একটি প্রতিসন্দর্ভ প্রস্তুত হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে নিজেকে ধরা দেননি। কিন্তু তাঁর সন্দর্ভে সৃষ্ট বয়ান তাঁর বিশ্বাসের জগৎকে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলেছে।

আত্মচিন্তায় মগ্ন একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি নিজেকে জানতে জানতে, বুঝতে বুঝতে এগিয়ে গেছেন। জীবনের অন্তঃশীল গতিতে নিজেকে জানার চেষ্টা, বিভিন্ন আবর্তে সমাজের বাস্তবের সংস্পর্শে এসে

বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস থেকে আত্মচিন্তার একমুখী জীবন থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে মোহানায় শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তার জগতে যাত্রার শেষে বিভিন্ন সমস্যাসংকুল আবর্তের ঘেরাটোপে বাস্তব জীবন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রেণিচেতনার মিলনই এই প্রতিবেদন ত্রয়ীর মূল তাৎপর্য।

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা – উপন্যাস ত্রয়ীর আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ভাবাদর্শ এবং প্রতিসন্দর্ভ শব্দ দু'টির স্পষ্টীকরণ জরুরি। প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ধারণায় স্পষ্ট হয় যে —

> *"হওয়া ও হয়ে ওঠা, যৌক্তিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্যে যে অপ্রতিরোধ্য আততি রয়েছে, তা মোকাবিলা করতে করতেই মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতিবিশ্ব নির্মাণ করে নেয়। এই নির্মাণের পেছনেই সক্রিয় থাকে ভাবাদর্শের প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকাশ্য উপস্থিতি।"*[৩]

মানুষ যখন থেকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে জীবনবোধ। আদিম যাযাবর জীবন-যাপনের পরিবর্তে এসেছে সভ্য সমাজ গড়ে স্থায়ী বসবাসের পরিকল্পনা। সংস্কৃতি নির্মাণের বোধ। সংস্কৃতি অর্থাৎ সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনের নিজস্ব জাতির অস্তিত্বের পরিচায়ক যাকে বলা যায়। তাই সমাজ-সংস্কৃতিকে ঘিরে মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট জীবন ও জীবনের সম্ভাবনাময় দিকগুলোর উন্মোচন ঘটে। জীবনে সবসময় অনুকূল পরিস্থিতি থাকে না। জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘর্ষ, রাজনৈতিক-সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিসরে ঘটে বিবর্তন। এই বিবর্তনরেখায় পরিলক্ষিত হয় সময়, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের জীবনপ্রণালীর পরিবর্তনের ইতিহাস। ইতিহাসের পরিবর্তনেই নতুন নতুন মূল্যবোধ জন্ম নেয় মানুষের মধ্যে। মানুষের বেঁচে থাকা এবং জীবনপ্রণালী নির্ভর করে মূল্যবোধের উপর। মূল্যবোধ যা জীবনসত্যকে উপলব্ধি করায়। এই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সত্তা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত কিছুকে ধারণ করে এবং মানুষের নৈতিক বিশ্বাস ও জীবনবোধের অন্তর্নিহিতের পরিব্যাপ্তিতে তা স্পষ্ট হয়। সময়, সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনকে কেন্দ্র করে মানবজীবনে কিছু বিশ্বাস প্রতীতি নির্মিত হয় যার নাম ভাবাদর্শ (Ideology)। পৃথিবীতে কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতিতে বিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ যেন একটি অপরটির পরিপূরক বা এপিঠ ওপিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই

স্বতন্ত্র সুস্থ সমাজ নির্মাণের সার্থকতা এই শব্দগুলোর ভাবধারায় প্রযোজ্য মনে হয়।

সাহিত্য যেহেতু সমাজকেই আধার করে, তাই সামাজিক অন্তঃকরণের সমস্ত কিছু সেখানে উপলব্ধ হবেই। সাহিত্যকে মানবজীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি বা সময়ের দলিল, মানবজীবনের প্রতিনিয়ত ঘাত-সংঘাতময়, সামাজিক রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রতিবেদন যাই বলি না কেন এটা আসলেই তো আধুনিক জীবনের মানুষের স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন অভিব্যক্তি পর্যালোচনারও ক্ষেত্র। সামাজিক পালাবদলে উপন্যাসের জন্ম, বিকাশ, বিষয় বিন্যাসের প্রসারতার নানা নমুনা আমরা দেখেছি। বিবর্তিত জীবনবোধে, ভাবাদর্শে, সাহিত্য রচনার আঙ্গিকে, কৌশলে, বিষয়বিন্যাসে ঘটে চলেছে নিরন্তর পরিবর্তন। উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা বঙ্কিমযুগে। পরবর্তী সময়ে তা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের হাতে প্রসারিত হয়েছে। জীবনভাবনার পরিবর্তনে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তা আবার বাস্তবের ভিন্নমাত্রাকে অবলম্বন করে সাধারণ নিম্নবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কখনও। আবার বিজ্ঞান নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, চেতনার অভিব্যক্তিতে মানিকের হাতে সূক্ষ্মভাবে তত্ত্ব নির্ভর হয়ে উঠেছে।

ত্রিশের দশকে আমাদের দেশের ইতিহাসে, সমাজে, সাহিত্যে একটি বিশাল পরিবর্তন এসেছে। একদিকে বিশ্বময় বৈপ্লবিক আবহাওয়া। অন্যদিকে বিভিন্ন তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মানুষের দ্বান্দ্বিক জীবনবোধ প্রকাশ লাভ করেছে সাহিত্যের মাধ্যমে। জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, প্রুস্ত ইত্যাদির বিশ্লেষণে, লেখায় কাজ করেছে ফ্রয়েডীয় সাইকোলজি। অর্থাৎ মানুষের অবচেতন মনের স্তরকে নির্ভর করে 'stream of consciousness' বা বাংলায় চেতনাপ্রবাহ রীতি। যেখানে একটি মানুষের চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় গভীর মানসিক জীবনবোধের অভিব্যক্তি। আর এই বোধকেই তো কেন্দ্র করে থাকে সমাজের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বাংলা সাহিত্যের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সূচনালগ্ন থেকে আমরা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক বিভিন্ন বর্গীভূত সাহিত্যরস পেয়েছি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, বাস্তব জীবনের কদর্যতায়, বিশ্ব জুড়ে বিশাল বৈপ্লবিক আবহাওয়ায়, তত্ত্বচিন্তার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যেও পরিবর্তনের সূচনা হল। ভাবপ্রধান, আবেগনির্ভর, কাল্পনিক, রোমান্স ইত্যাদির পরিবর্তে নিতান্ত বাস্তবজীবন, বস্তুবাদী জীবনবোধে সাহিত্য অঙ্গনেও বিবর্তনরেখা অঙ্কিত হল। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, সবুজপত্রে বিভিন্ন বাস্তববাদী লেখকরা কলম ধরলেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র নতুনভাবে নতুন চিন্তাধারায় উন্মোচিত হতে শুরু করল। এই সময়ের ধারাতেই আমরা তাদের থেকেও দুজন ব্যতিক্রমী বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ,

মননশীল রচয়িতাকে আবিষ্কার করি। যারা সমস্ত কিছু গ্রাহ্য করেও ব্যতিক্রমী চিন্তায়-চেতনায়, উপন্যাসের রচনাশৈলীতে, বিষয়বিন্যাসের নির্বাচনে, আমাদের নতুন আস্বাদ দিয়েছিলেন। একজন পূর্বোক্ত আলোচিত গোপাল হালদার এবং অন্যজন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যার রচনাসম্ভার বা বলা শ্রেয় একমাত্র ব্যতিক্রমী প্রতিবেদন ত্রয়ী এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। গোপাল হালদার এবং ধূর্জটিপ্রসাদের হাতেই বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসের সূচনাক্ষণ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজীবন যিনি স্বতন্ত্র চিন্তায়, বুদ্ধিতে যুক্তিবাদী মননে ছিলেন অবিচলিত। তাঁর সমস্ত রচনায় তিনি রেখেছেন স্বতন্ত্র সমালোচনা ও প্রখর বুদ্ধির ছাপ। সত্য দিক-উন্মোচনে তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। সমালোচনায়, আত্মসমালোচনায়, তির্যক ব্যঙ্গ-পরিহাসে, যুক্তি, বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তা-চেতনার স্ফুরণে 'মেকীপনা'কে নস্যাৎ করেছেন সবসময়। শিক্ষাক্ষেত্র, গবেষণাকর্ম, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় তিনি সবসময় প্রচলিত পদ্ধতি (system) এবং অন্ধ অনুকরণকে সমালোচনা করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে ভাবধারা, যুক্তি এবং পদ্ধতির কথা বলতেন, তারই অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর প্রতিবেদনে। সাহিত্য রচনার অঙ্গবন্ধন কেমন হবে, বিষয়বিন্যাস কিরূপ হবে, সেখানে নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত থাকবে না। চিন্তাই চিন্তার বাহন হবে। একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, হাজারটা প্রতিপ্রশ্নের মধ্যে তার উত্তর নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। তাঁর চিন্তাচেতনার এই দিকগুলিই উন্মোচিত হয়েছে অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা উপন্যাস ত্রয়ীতে। কোনো ঘটনা নয়, একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই চিন্তা-চেতনার স্রোতে এগোবে সন্দর্ভ (আলোচনা পদ্ধতি) discourse। একটি সাহিত্যিক প্রতিবেদনের গঠন-প্রণালী, বিষয়বস্তু কীরকম হবে। তারই একটি প্রতিসন্দর্ভ (counter discourse) যেন প্রস্তুত করেছেন তিনি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই হয়তো তার এই রচনাকর্ম। কারণ এমন ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ, মননঋদ্ধ সাহিত্যিক একটিই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন ও একটিমাত্র গল্প সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর দিনলিপির এবং প্রবন্ধ নিবন্ধের টুকরো টুকরো আলোচনা-সমালোচনায় সাহিত্যপ্রণালী সম্পর্কে নানা মতামত উদ্ধৃত হয়। তারই নিরিখে তাঁর উপন্যাসত্রয়ীর একটি বিশ্লেষণী পর্যালোচনাই এই সন্দর্ভে ব্যক্ত হয়েছে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা — রচনারীতি, বিষয়বস্তু এবং প্রকরণের দিক দিয়ে অভিনবত্বের দাবি রাখে। ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য বা শিল্প বিষয়ে নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে সূক্ষ্ম বৌদ্ধিক জ্ঞান-ভাবনা এবং বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর অভিনব জ্ঞানপিপাসা ও জিজ্ঞাসার

নিবারণে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নিখুঁত ও স্বতন্ত্র জ্ঞানার্জনের স্পৃহায় তাঁর মানস গঠনও হয়েছিল অত্যন্ত পরিশীলিতভাবে। তীক্ষ্ণ ধারালো বক্তব্যে-পর্যালোচনায় তাঁর অধিগত প্রত্যেক বিষয়ই স্পষ্ট রূপে ফুটে ওঠে। এবং সাহিত্য বিষয়ে চিন্তা-ধারণারই একটি পরিশীলিত শৈল্পিক রূপকেই তুলে ধরার প্রয়াসেই যেন অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা ত্রয়ীর প্রকাশ।

১৩৪০ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ 'পরিচয়' পত্রিকায় যুধিষ্ঠির দাস ছদ্মনামে 'এই জীবন' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দুই-একজন নিকট বন্ধুর উপদেশে এই গল্পটিকেই একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে। অন্তঃশীলা 'এই জীবন' নামক গল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ। অন্তঃশীলার সমাপ্তির পথে লেখকের মনে হয়েছিল অন্তঃশীলায় তাঁর বক্তব্য যেন একটু অস্পষ্ট রয়ে যাচ্ছে। তাই অন্তঃশীলার সমাপ্তিবিহীন সমাপ্তিরেখা থেকেই আবর্তের সূচনা। তৃতীয় পর্ব মোহানা সম্পর্কে লেখক নিজেই 'মোহানা'-এর ভূমিকায় লিখেছেন সে সময় অন্তঃশীলা আবর্তের সমালোচনা পড়ে তিনি মোহানার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে প্রধান দুটি চরিত্র তখনও অপরিণত। এবং প্রধান চরিত্র দুটোর পরিণতি লক্ষ করেই তৃতীয় পর্বের অবতারণা। বিভিন্ন মন্তব্য থেকে এই ত্রয়ীর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে আত্মজৈবনিক উপাদান সম্বলিত উপন্যাসগুলো সবসময়ই পর্বে পর্বে বিন্যস্ত হয়ে মূল বক্তব্যকে প্রসারিত করে। যা এই ধরনের উপন্যাসের প্রধান ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পড়ে। পূর্বোক্ত অধ্যায়ের আলোচনায় শরৎচন্দ্র এবং গোপাল হালদারের ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে তাঁদের উপন্যাসে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ করেছি। তাঁদের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিজীবন, সচেতন জীবনদর্শনের কিছু কিছু উপকরণ কখনও হুবহু ধরা দিয়েছে। তখন তা নিজেই সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সমাহিত হয়ে পড়েছে। আবার সাহিত্যিক ও শৈল্পিক দায়ে গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজনে বৃহৎ জীবন অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে প্রসারিত করেছেন। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে তার সাহিত্যে কোথাও হুবহু আত্মজৈবনিক উপাদান লক্ষিত হয় না। তিনি একজন 'intellectual type' চরিত্রকে স্থির করেই এগিয়েছেন। তাই এখানে ব্যক্তি ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন বা পারিপার্শ্বিক বর্ণনা পাই না। পাই তার জীবন-অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম তাৎপর্য, বৌদ্ধিক চিন্তা-চেতনার গূঢ় তত্ত্ব। কঠোর জ্ঞান সাধনায় আহৃত মৌলিক চিন্তার বোধ, বিশ্বাস বা প্রতীতিতে তৈরি ভাবাদর্শ (ideology) যা তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে, প্রথাসিদ্ধ সাহিত্য ভাবনার বিপ্রতীপে প্রতিস্থাপন করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ নভেলের মানদণ্ড বিচারে তাঁর মানস চরিত্র খগেনবাবুর মুখেই বিবরণ

দিয়েছেন —

> *"অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাঁটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথাও বা আবর্ত, এই তো জীবন! মোহানা কোথায়? এরই প্রতিচ্ছবি ঠিক না, এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিস্টের কাজ — অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ।"*[৪]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খগেনবাবুর জীবন সম্পর্কে গভীর বোধ থেকেই উপন্যাসের ভেতরই উপন্যাসের মূল অন্তর্নিহিত ভাবনাটিই লেখক প্রকাশ করে দিলেন। উপন্যাসের মূল আধার বা উপাদান কী হবে তারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক ভাবনাটি যেন তিনি উত্থাপন করলেন চরিত্রগুলোর আলাপচারিতায়।

ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস ত্রয়ীর মধ্যে আত্মজৈবনিক উপাদানকে খুঁজতে হলে তাঁর বৌদ্ধিক সত্তাটিই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনা, মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণ তাকে প্রখর তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে দেশ-বিদেশের শিক্ষিত গুণীমহলে। ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথমত সমাজতত্ত্ববিদ, পেশায় অর্থনীতির অধ্যাপক, ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে তাঁর অনুরাগ অপরিসীম। পাশ্চাত্য পুঁথিপত্র পঠনে, আয়ত্তে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর সৃষ্ট মানস চরিত্র নায়ক খগেনবাবুও শিক্ষা-দীক্ষায় পরিণত, বিভিন্ন বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা আয়ত্ত করা তাঁর শখ। ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি তারও অগাধ রসবোধ ও পাণ্ডিত্য। সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে এই মানসিক একাত্মটাই অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা - ত্রয়ীর আত্মজৈবনিক ভিত্তি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্তঃশীলা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তথাকথিত একজন ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দর্শানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যার প্রথম প্রতিক্রিয়া ভাবজগৎ ও বাস্তবজগৎ থেকে পলায়ন করা। আবার একথাও বলেছেন যে, পলায়ন অসম্ভব। এর প্রমাণ পরবর্তী পর্বগুলোতে পাওয়া যায় আত্মম্ভরী, আত্মমুখীন খগেনবাবুর রমলার প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবার মোহানায় শ্রেণি-সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে। লেখক উল্লেখ করেছেন 'তথাকথিত' অর্থাৎ সেই সময়ের (ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের) বুদ্ধিজীবীর মানসিক অভিব্যক্তি। তাহলে সেই দশকটা একটু ফিরে দেখা প্রয়োজন। ত্রিশের-চল্লিশের

দশকে দেশের পরিস্থিতি উত্তাল, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব চলছে তখন। একদিকে গান্ধীবাদী কংগ্রেস অন্যদিকে বিশ্বময় দাপিয়ে বেড়ানো কমিউনিজমের প্রভাব। রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে চলছে প্রতিনিয়ত পালাবদল। বিশ্বজোড়া বিপ্লবের হাওয়ায় নবজাগরণের ছোঁয়া লেগেছে ভারতবর্ষে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মোহে এলিট শ্রেণির কিছু লোকেরা দিক্‌ভ্রান্ত। আবার সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটেছে বিরাট আন্দোলন। ফ্রয়েড ও ইয়ুং এর মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাবে বিশ্বে সাহিত্য রচনার রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ভারতবর্ষের সাহিত্য রচনার ভাব, বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে।

এই দশকে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে বিরোধিতা করে কল্লোলপন্থীরা কল্পনার অভিজাত অধিরাজ্য ও অতিশয় ভাবালুতার বিপরীতে বাস্তবতাকে ধরার চেষ্টা করলেন। প্রথাসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ধারায় ভাব, বিষয়বস্তু তার গতি-প্রকৃতি, রীতি ইত্যাদির প্রতি বিরোধিতা করা হল সত্যিই, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ নতুন ভাবধারায়ও স্বতন্ত্র, মৌলিক কোনও বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন না। তাঁর দৃষ্টিগোচর হল দোলাচল ভাঙাগড়ার সময়ে শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণসর্বস্বতা। বিকৃত যৌনতার রূপ, নীচুশ্রেণির অন্ধকার জীবনের ছবির প্রতি প্রবল আকর্ষণ। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথাভাঙার প্রথায় নতুনত্ব আবিষ্কারের পথকে মান্যতা দিতে পারেননি। ধূর্জটিপ্রসাদ সাহিত্যের বাস্তব, বা বাস্তব সাহিত্যের Methodology (পদ্ধতি) বৈজ্ঞানিক হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রকৃত ঔপন্যাসিকদের concrete হওয়া উচিত মনে করতেন। কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি গোষ্ঠীর প্রথাকে ভাঙতে নতুন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নবাবিষ্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল প্রবল উত্তেজনা, সেখানে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রকৃত জীবনবোধ ও অন্তরানুভূতির অভাব লক্ষ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মন্তব্য থেকেই তাঁর উপন্যাস ভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়—

> *"শুনেছি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করেছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোনো নতুনত্ব পাইনি। সকলে এখনও ব্যক্তিবাদী। . . . নতুন সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতনতার সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কেন হলো, কীভাবে হলো — এই জ্ঞানের পরিচয় পাই না। আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তাই নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক,*

তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে। ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব মানি, তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, তার আগমন বাঞ্ছনীয় ভাবি, অন্য দেশে তার সৃষ্টি হচ্ছে জানি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে আঙ্গিকের অনুকরণ ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছু হয়েছে কি? সন্দেহ হয়, হয়নি। . . . সমাজ-জীবনের রূপ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায়, তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে ভুল করতে আমি রাজি নই।"[৫]

ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদ কল্লোলপন্থী প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে দেহসর্বস্ব ভোগবাদী দর্শন, জীবন সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক, অগভীরতা, অন্তঃসারশূন্যতার ফলে সর্বত্র একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলোকন করেছিলেন। তাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণে, বুদ্ধির জাল বিস্তার করে উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি, আঙ্গিকে নতুন পথ প্রশস্ত করলেন। প্রগতিশীল লেখকদের রূপকে কংক্রীট করার প্রবণতায় লক্ষ করলেন তারা মূলত ঘোর 'রিয়ালিস্ট' এবং 'ন্যাচারালিস্ট' হয়ে পড়েছেন। কংক্রীট অর্থাৎ কঠোরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া। বুদ্ধির খেলা দিয়েই নৈর্ব্যক্তিক হওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী সময়ে যদি ব্যক্তিগত সম্পর্ক সংস্থাপিত হয় তা গৌণরূপে হয়ত থাকতে পারে। তাতে গুরুতর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তাঁর উপন্যাস ত্রয়ীতে তিনি সচেতনভাবেই প্রথম নতুন আঙ্গিক ব্যবহার করলেন। যাকে বিশ্বসাহিত্যে বলা হয় 'stream of consciousness' বা বাংলায় চেতনাপ্রবাহ রীতি। এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুণ হল এখানে মানুষের অবচেতন স্তরের গভীর বোধকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা যায়। এবং মানুষের চিন্তার শক্তির স্তরটি খুব সুন্দরভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই তাঁর 'ত্রয়ী উপন্যাস' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে —

''অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা — তাদের প্রধান কাজ stream of consciousness ততটা নয়, যতটা romantic প্রভাব থেকে concrete এ আসা। আশ্চর্য! তিন চারজন পাঠক ছাড়া কেউ ঠিক বোঝেননি — বুঝলে সুবিধা হতো। দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক realism চায়।"[৬]

ধূর্জটিপ্রসাদ দেশের সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই অর্থাৎ শিল্পকলার প্রত্যেকটি অঙ্গনের ফাঁককেই যেন তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর আখ্যানে। তিনি প্রচলিত অগভীর, মেকি অসাড়

সমস্ত কিছুকেই যেন প্রকৃত জ্ঞানের আলোকবর্তিকার বিকিরণে উদ্ভাসিত করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন শিক্ষিত মহলে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা - ত্রয়ীতে চরিত্রের ব্যাখ্যানেই বা সমালোচনায় প্রবন্ধধর্মী পদ্ধতিও যেন ধরা দেয়। তাঁর সৃষ্ট মন ধার দেওয়া খগেনবাবু দীপ্ত জ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠ তর্ক ও গভীর রসবোধের আলোচনায় উপন্যাস বিষয়ক, সংগীত বিষয়ক দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করেন। উপরে উদ্ধৃত তাঁর মন্তব্যে 'দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক' কথার খোঁচায়, তিনি ধরিয়ে দেন আমাদের দেশীয় অগভীর চিন্তায় শিক্ষিত শ্রেণির বুদ্ধিবাদকে। তিনি তথাকথিত 'রিয়ালিজমের' অন্তঃসারশূন্যতা, ভাবাদর্শকেই যেন নস্যাৎ করে তির্যক বিদ্রূপ করেছিলেন 'রিয়ালিস্ট' নামক গল্প সংকলনে।

রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদের গল্প সংকলন পাঠের পর তাঁকে চিঠিতে বলেছিলেন —

> *"গল্পের ছলে তুমি যে-কথা বলতে চেয়েছে ব্যাখ্যান করে আমি সেই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ রিয়ালিস্ট তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছ। মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট হবার জন্যে কোমর বাঁধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় unreal, তুমি তোমার গল্পে বারবার দেখিয়েছ আদর্শবোধে রিয়ালিজমের যারা চর্চা করে তারা একটা ভঙ্গির সাধনা করে মাত্র, তারা নিজেরাও ভুলতে পারে না তারা রিয়ালিস্ট অন্যকেও ভুলতে দিতে চায় না; – তারা রিয়ালিজ্‌মের পুতুলবাজি করে। এই সঙ্গে এই কথা বলাও চলে, আদর্শবাদেরও পুতুলবাজি আছে—।"*[৭]

রিয়ালিস্ট গল্প সংকলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবনা বোঝা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ তথাকথিত রিয়ালিজ্‌ম তত্ত্ব বা গল্প, উপন্যাসের সন্দর্ভের নতুনত্বের ভিতরে যে অসাড়তা লক্ষ করেছিলেন তারই প্রতিসন্দর্ভ নির্মাণে তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রতিস্থাপন। তাই তাঁর মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিবাদী, দার্শনিক মননশীল পাঠকই প্রতিপ্রশ্নে উপন্যাসের ও গল্পের ভেতরই তার রীতি-আঙ্গিক, ভাব বিষয়ে পর্যালোচনা করতে পারেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ সচেতনভাবেই যেন দেশ-বিদেশের সামঞ্জস্যে নতুন মূল্যবোধ ও জীবনবোধে সাহিত্য

রচনার ভাবকে পরিপুষ্ট করলেন। এবং প্রথাসিদ্ধ ও প্রথাবিরোধী সমস্ত সাময়িক ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করে প্রকৃত গল্প ও উপন্যাসের সন্ধানেই গল্প, উপন্যাসের অন্তরেই তাঁর বীজ বপন করে গেলেন। যার ফলে সেই দশকেও আমরা চর্বিতচর্বণ বর্জিত, অনুকরণহীন কিছুটা দেশীয় পদ্ধতিতে নিজস্ব ধরনের মৌলিক চিন্তা-ভাবনায় ব্যতিক্রমী সাহিত্যরস পেয়েছি। যদিও সাধারণ পাঠককুলে আবেগহীন, ভাবহীন সাহিত্যরূপে ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী সমাদৃত হয়নি ততটুকু। কিন্তু আজ যখন বিশ্বময় বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে আমরা জগৎ ও জীবনকে বিচার করতে ব্যতিব্যস্ত, সেখানে ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের জীবনপ্রণালীর সঠিক মাত্রাটিকেই ধরিয়ে দেন। জীবনে কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল বা তার পর কীভাবে সমাধান হল— এর অভিজ্ঞতা বা ব্যাখ্যাই জীবন নয়। বরং যা ঘটেছিল তার থেকে যে তাৎপর্য বেরিয়ে পড়ে জীবনকে আরও গভীর বোধে, চিন্তায় উজ্জীবিত করে। একটি প্রশ্ন সম্মুখীন করল হাজারো প্রতিপ্রশ্নের, তার মূল্যায়নই জীবনের ভিত্তি। পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের (reader-response theory) দৌলতে লক্ষণীয় সাহিত্য বা জীবনে কোনও শেষ সিদ্ধান্ত থাকে না, থাকতে পারে না। হয়তো আপাত একটা মীমাংসায় (compromise) আমরা পৌঁছাই, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। সিদ্ধান্তহীনতাই মূল, কারণ যাকে সিদ্ধান্ত বলি, তা আসলে হয়তো জীবনের গাণিতিক যোগ-বিয়োগ-ভাগ-গুণের ধারাবাহিকতায় বোঝাপড়ার (compromise) সম্মিলিত ফল। উপন্যাস যেহেতু জীবনেরই সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। যে-মানুষের জীবনকে বাইরে ভেতরে ধারণ করে নিজের মধ্যে। জীবন এবং জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন আবর্তের সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু জীবন চলে অন্তঃশীল গতিতে। তার শেষ নেই কোথাও, তাই সিদ্ধান্তও নেই বলা যায়। তাই লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ জীবনদর্শনের লৈখিক দর্পণ উপন্যাসেই, জীবন ও উপন্যাসের মূল বীজের গূঢ় তত্ত্বটিকেই বলে দেন খগেনবাবুর বিশ্লেষণে —

> *"সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে; তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিশিষ্ট হয়ে যাবে।"*[৮]

ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

→ প্রকাশকালের দিক দিয়ে এবং সচেতন চিন্তায় ধূর্জটিপ্রসাদই বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ নামক

নব্য রীতির (stream of consciousness) সূচনা করলেন। তাঁর অন্তঃশীলাতেই প্রথম চেতনাপ্রবাহরীতি প্রতিষ্ঠা পেল।

→ তাঁর আখ্যানে মাঝে মাঝে উঁকি দেয় প্রবন্ধধর্মিতার লক্ষণ। যা তার আখ্যানকে বিদীর্ণ করে ব্যাখ্যানের পথেই যাত্রা করে।

→ তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী কাহিনি এবং ঘটনার বাহুল্যবর্জিত। উপন্যাসের সহযোগী চরিত্রগুলি সাবিত্রী, মাসীমা, রমলা, সুজন-বিজন, এবং প্রধান চরিত্র খগেনবাবুর জীবনবৃত্তান্ত পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। চরিত্রগুলোর স্বভাব, আচরণ এবং চিন্তা ও ইঙ্গিত থেকেই বোঝা যায় তাদের।

→ উপন্যাস ত্রয়ীতে বহির্জগত বা জীবন অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্গত মানসিক জীবন প্রক্রিয়াই মুখ্য। অর্থাৎ তাঁর শৈল্পিক অভিপ্রায়টি চিন্তার মাধ্যমে জীবনের অভিব্যক্তি তুলে ধরে চরিত্রে।

→ উপন্যাসের সূচনা সাবিত্রীর আত্মহননকে কেন্দ্র করে। সাবিত্রীকে জীবিত অবস্থায় আমরা উপন্যাসে পাই না। তাই তার চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বামী খগেনবাবুর অবচেতন মনের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় ধরা পড়ে। অন্যান্য চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন লক্ষণীয়। এখানে প্রত্যেকটি চরিত্রের জীবন মনস্তত্ত্বের জটিল আবর্তে সম্মুখের দিকেই ধাবিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের বিবর্তিত সত্তার রূপ সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

→ এই উপন্যাস ত্রয়ীতে নাটকীয় রীতিও লক্ষ করা যায়। চরিত্রগুলোর কথোপকথনে অনেক সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে।

→ ত্রিশের দশকে রচিত উপন্যাস ত্রয়ীর তিনটে মাত্রা লক্ষণীয়, যথা – (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, (খ) যুগ সংকটের প্রতিকূল আবর্তে আস্তিত্বিক সংকট ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, (গ) মার্কসীয় ভাবধারায় বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক চিন্তাচেতনা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষিত তরুণ সমাজের আকর্ষণ।

→ সমাজতত্ত্ববিদ ধূর্জটিপ্রসাদের 'personality' তত্ত্বটিও উপন্যাস ত্রয়ীর ক্রমবিকাশে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ যাকে তিনি বলতেন 'ব্যক্তিত্বের মুখশ্রী'। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁর কাছে তথাকথিত পশ্চিমি আত্মকেন্দ্রিক individual নয়। বরং সামাজিক চিন্তায় সমন্বয় সাধনে তাঁর ব্যক্তিসত্তার

উত্তরণ। তাঁর সমাজতত্ত্বের মূল পরিপ্রেক্ষিতে ছিল ভারতীয় সমাজ, ব্যক্তির স্বরূপ, ব্যক্তি হবে নিজের অধীন কিন্তু সংযোগী সত্তা, সমবায়ী এবং সামাজিক সম্পর্কে দায়বদ্ধ। personality বলতে তিনি সংযোগী, সমবায়ী ব্যক্তিত্বকেই বোঝাতে চেয়েছেন। ব্যক্তি individual নয়, হবে person।

ধূর্জটিপ্রসাদ আচারে-আচরণে, জ্ঞানে, মুক্তচিন্তায়, বৌদ্ধিক মননে ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর জীবন, সাহিত্য এবং বিভিন্ন বক্তব্য থেকে মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাচেতনার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ধূর্জটিপ্রসাদকে ত্রিশের দশকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্বের দাবিদার বলা যায়। জ্ঞানের সীমানাকে কোনও গণ্ডির মধ্যে তিনি আটকে রাখেননি। ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে ছিল বহুমুখী এষণার ভাণ্ডার। মূলত একজন সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ রূপে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মবিশ্লেষণে, আত্মনিরীক্ষায় এবং আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্দীপ্ত রয়েছেন আজীবন। তিনি বুদ্ধির শৌখিনতায় নয় বরং আত্মানুশীলনে কর্মের সঞ্চারে বিশ্বাসী। সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি হয়ে সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রকলা, নাটক, গল্প, উপন্যাসের খুঁটি-নাটি বিষয়ে ছিল মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণ। ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান পরিশীলিত হয়েছিল তিনজন সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে। প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাবতে ও চিন্তাসূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করতে শিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে অধীত বিদ্যাকে হজম করে কঠিন বিষয়কে স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করার সূত্রটি অর্জন করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সমগ্রতার বোধ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, আত্মস্থতা, আত্মশক্তি-চর্চা, ধৈর্য, সংযম ও ব্যক্তিগত মনস্তাপের ঊর্ধ্বে সৃষ্টিশীল কাজে নিরত থাকতে শিখেছিলেন। তাই ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য আলোচনার পূর্বে বিচিত্র লোকটির ব্যক্তিত্ব বোঝা জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাঁর মানসিক চিন্তা-ভাবনার সূত্রগুলির গ্রন্থনা জরুরি। তাঁর জীবনে সমাজতত্ত্ব ও মার্কস্‌সিজমের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সমাজতত্ত্বের মূলে ছিল 'personality'-র গুরুত্ব। personality-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ব্যক্তিত্ব'কেই সমার্থক জ্ঞান করে তিনি বলেছিলেন —

> *"আমার ব্যবসা সমাজতত্ত্ব নিয়ে, যার তত্ত্বকথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্বন্ধের ভেতরে ও অন্তরালে যে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে তাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলা।"*[৯]

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাসমূহের মূলে লক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার চিন্তা-চেতনায় যে মানসিক ক্রিয়া কাজ করে, বিভিন্ন প্রশ্ন উস্‌কে দেন। কিছুটা আভাসে, ইঙ্গিতেই যেন ধরিয়ে দেন বাকিটা পাঠক বা শিক্ষিত শ্রেণির প্রতি প্রশ্নবাণেরই কাজ করে। কোনও কিছুই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন না। তাই রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, তাঁর পাত্ররা তাঁর মতই চিন্তাশীল, তাঁর দলে লোক বেশি নেই। নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি নিজেই একটি মীমাংসায় উপনীত হয়ে বলেছিলেন দিনলিপি 'ঝিলিমিলি'তে—

> *"এইটা নিয়ে উনিশখানা বই লিখলাম। আরো দু-একটা লেখা চলত, যদি স্বাস্থ্যে কুলোত। কী লিখেছি তাই জানি না। তবে বোধ হয় একটা মোটা ধারা আছে। তাকে personality বলা চলে — নভেলে তাই, সমাজতত্ত্বে তাই অর্থনীতিতে তাই। ইতিহাসেও তাই, সঙ্গীতেও তাই। এরই আশেপাশে কার্ল মার্কস্‌। আমার জীবনে মার্কজিসম এর প্রভাব বেশি। . . . মার্কসিজম ছাড়া অন্য অর্থনীতিতে অবিশ্বাসী। . . . সমাজতত্ত্বে ইতিহাসে মার্কসিজম চলে। তাই এখনও লিখি। আমার নভেলে তাই আছে। নিজেকে Marxologist বলা চলে।"*[১০]

ধূর্জটিপ্রসাদের বৌদ্ধিক সত্তাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তা-চেতনা, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প সম্পর্কে প্রতীত বিশ্বাসের একটু প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া গেল। যুগবদলের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধে গড়ে উঠেছিল তাঁর ভাবাদর্শ (ideology)। বিশ্বসাহিত্যের নব্যরীতির সঙ্গে পরিচিত লেখক নিজস্ব সমাজভাবনা ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবাদর্শের সূত্রগুলিকে গ্রথিত করেই উপন্যাসের মাধ্যমেই উপন্যাসের ভিতরে ভিতরে সংস্থাপন করলেন একটি প্রতিসন্দর্ভ। যা একই সঙ্গে উপন্যাস এবং উপন্যাস ভাবনার নতুন পদ্ধতিকে (Technique) প্রসারিত করেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সত্তাকে (self) সংযোগী করে সামাজিক সত্তায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর সৃষ্ট ত্রিশের দশকের intellectual type খগেনবাবুকে অন্তঃশীলায় আত্মকেন্দ্রিক, আত্মম্ভরী জীবনকে ক্রমশ অতিক্রম করতে হয়েছে জীবনের বিভিন্ন আবর্তে। সহযোগী সত্তা রমলা, সুজন-বিজন-সফীকদের সংস্পর্শে। ব্যক্তিগত (individual) থেকে বেরিয়ে সে নিজেকে অন্যদের সংস্পর্শে সংযোগ করেছে। এবং প্রত্যেকটি সত্তা যেহেতু সামাজিক অন্তর্বলয়ে বাস করে তাই সামাজিক

সমসাময়িক সমস্যা এড়িয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই খগেনবাবু একমুখীন বুদ্ধিবাদী জীবন অতিক্রম করে বিভিন্ন আবর্তের সম্মুখীন হয়ে মোহানায় সামাজিক, রাষ্ট্রিক সমস্যার সংগ্রামে শ্রেণিচেতনায় সফীকদের সহায়ক হয়ে উঠেন। যদিও তিনি রাজনৈতিক দলীয় কর্মী নন। এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদেরই মন্তব্য স্মরণ করতে হয় —

> *"— সামাজিক সত্তা, সমস্যা ও তার স্বীকার, নিরাকরণ বাদ দিলে সাহিত্য হয় একদেশদর্শী, প্রাণহীন, ছোট, হালকা, ঠুনকো, বেলোয়ারী। . . . সাহিত্যে নিজেকে বাদী-প্রতিবাদী হতেই হবে, . . . জীবন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতেই হবে। .. যে সাহিত্যিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের গূঢ় কথা বোঝাতে পেরেছেন তিনিই বিশ্বসাহিত্যিক, তিনিই দেশের প্রকৃত নেতা।"*[১১]

ধূর্জটিপ্রসাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে ধরেই আমরা দেখি একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই তার মানসিক বিকাশ, জীবনবোধ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের ইতিহাস ধারণ করেছে কিছু সাহিত্য। পূর্বোক্ত আলোচনায় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চরিত্রের আত্মজীবন থেকে গভীর জীবনবোধে উঠে এসেছে সামন্ততন্ত্র প্রথার কলুষতা, ধনিকতন্ত্রের শোষণ, উন্নত পরিবেশের তুলনায় রক্ষণশীলতায় আক্রান্ত ভারতবর্ষের অনুন্নত অবস্থার বিবরণ। যা এক কথাই বৃহৎ বঙ্গদেশের পল্লীসমাজ, নাগরিক জীবন ইতিহাসেরই বৃত্তান্ত। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিতর্কমূলক মহাকাব্যিক উপন্যাস 'গোরা'তে হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের সংঘাত, হিন্দুত্বের উগ্র ধ্বজাধারী প্রতিভূ গোরার মধ্য দিয়েই কলকাতার নাগরিক জীবন, ইংরেজের অত্যাচার, চরঘোষপুরের চাষিদের সংঘর্ষ প্রধানত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক চলচ্ছবিই প্রকাশিত। গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা' এর অমিতের চেতনায় উঠে এসেছে ত্রিশের দশকের অস্থির আন্দোলিত বৈপ্লবিক ইতিহাস বা মহাকাব্যের সংগ্রামের ইতিহাস। আর স্বয়ং ধূর্জটিপ্রসাদের একমাত্র ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে লেখক 'খগেন' চরিত্রের মধ্য দিয়ে ত্রিশের দশকের বুদ্ধিজীবীর মানসিক অভিব্যক্তিকে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে চরিত্রটিকে একটি ঘটনার সম্মুখীন করে পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন লেখক। পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছেন বুদ্ধিবাদ কি নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক নাকি সামাজিক সমস্যায় ও কর্মে দায়বদ্ধ। খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া (reaction) পলায়ন। কিন্তু জীবনের পরীক্ষাগারে দেখা যায় পলায়ন অসম্ভব। বাখতিন কথিত অমোঘ সত্যটিই জীবন্ত হয়ে ওঠে : 'Self can never be a self sufficient construct, Every

being is a co-being'। পলায়ন করতে গিয়ে ধরা পড়েন রমলার হাতে খগেনবাবু। আরও সামাজিকীকরণে জড়িয়ে পড়েন শ্রমিক আন্দোলনে। যা ত্রিশের দশকের সর্বব্যাপী সাধারণ শ্রেণির বৈপ্লবিক সময়ের দলিল। এখানে একজন বুদ্ধিজীবীর মানসিক অভিব্যক্তি, প্রতিক্রিয়া এবং সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমবায়ী জীবনালোকের সত্যটিই প্রকাশ পায়। তাই ধূর্জটিপ্রসাদ 'বয়ান ই তহরিরি'-তে স্পষ্টীকরণে বলেন —

> *"বইখানিতে চিন্তার চেয়ে তার সংযোগই অনুধাবনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে প্রুস্ত ও উল্‌ফ-এর পন্থাই লেখকের একমাত্র পন্থা। খগেন intellectual giant মোটেই নয়, এ যুগের intellectual type মাত্র, যার মননক্রিয়া বিশুদ্ধ নয়, স্মৃতি এবং ভাবমিশ্রিত।"*[১২]

জীবন নদীর স্রোতের মতো নিরবচ্ছিন্ন একটি প্রবাহ। এই জীবন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দুইভাবেই প্রবাহিত। বাহ্যিক জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়। আর এই ঘটনাগুলোর ফলে আভ্যন্তরীণ মানসে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ মানুষের অন্তর্লীন চেতনা প্রচ্ছন্নগতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। যে চিন্তা করতে জানে তার মধ্যে প্রখর হয় চেতনা। চেতনাই মানুষের অন্তঃকরণের নিয়ামক। যা মানুষকে আত্মানুসন্ধান ও আত্মনিরীক্ষণে উৎসাহিত করে। চেতনা মানুষকে জাগিয়ে রাখে, এই জাগরণ অন্তর্জাগরণ। যা মানুষের গভীরতর চিন্তনস্তরে নাড়া দেয়। তাকে ভাবায়, দোলায় মনের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিয়ে যায়। যার ফলে সচেতন মানুষ মাত্রেই এই গভীর স্তরে উপলব্ধি করে জীবনসত্যের বোধকে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত ধারার বিপ্রতীপে গল্পাংশ বহির্ভূত 'চিন্তাস্রোতের বিবরণে' ধূর্জটিপ্রসাদ নিয়ে এলেন অবচেতন স্তরের ব্যাপ্তিতে গভীর জীবনবোধ। যেখানে রয়েছে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও মননের উপলব্ধি, অনুভব ও চৈতন্য, নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির অবতারণা। উপন্যাসে প্রথম পর্বে 'অন্তঃশীলা' নামকরণের মধ্যেই ঔপন্যাসিক তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবন এবং নদীর অর্থ যেন ধূর্জটিপ্রসাদের বিষয়বিন্যাসে এবং উপন্যাসের নামকরণে সমার্থক রূপেই ধরা দেয়। কারণ দুটিরই উৎস আছে, শুরু আছে, শেষ নেই কোথাও। ঘাতে-প্রতিঘাতে, বাধা-বিপত্তিতে এক একটা বাঁক বা মোড় নেয়। কিন্তু তার প্রবাহ থামে না। যার গতি এবং স্রোত শুধু সম্মুখের দিকে। শিথিলতা, জোয়ার ভাঁটা সমস্ত কিছুকে বহন করে নিরবচ্ছিন্ন তার প্রবাহ। অন্তঃশীলা আসলে শান্ত ধীর লয়ে মানবমনের অন্তর্জগতের

প্রবহমানতা। তিনি এখানে 'চিন্তাস্রোতের বিবরণ' দিয়েছেন। উপন্যাসের শুরু স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহননের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। এই অপমৃত্যুকে কেন্দ্র করেই নায়ক খগেনবাবুর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। উপন্যাসে অনর্গল অন্তর্মুখী চেতনাপ্রবাহ সবসময় লক্ষ করা যায়। লেখকের কথাকে ধরেই বলা যায় —

> *"একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তবজগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হ'ল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। এর মধ্যে না আছে আত্মকথা, না আছে ভাবগত প্রেরণা। অথচ খুঁটিনাটি ঘটনার পিছনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। সে সব অভিজ্ঞতা চিন্তার ভেতর দিয়েই চালু হয়ে এসেছে।"*[১৩]

অন্তঃশীলা গতির উপন্যাস ঠিকই, সেখানে গল্প-নির্ভরতা নেই। একটি ঘটনা অর্থাৎ স্ত্রী সাবিত্রীর অপমৃত্যুকে কেন্দ্র করে অতীত ও বর্তমান নায়ক খগেনবাবুর চেতন-অবচেতনে ঘোরপাক খাচ্ছে। এমনকি সাবিত্রী কেন মরল তারও কোনো কার্যকারণ সূত্র দেওয়া হয় না। বরং খগেনবাবুর মাধ্যমেই এক একটি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে চেতন-অবচেতন মনের চিন্তাস্রোতে কিছুটা ইঙ্গিতে আকারে ধরা যায়। বহির্বাস্তবের কোনও কোনও প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে নায়কের অন্তর্জগতের চিন্তাস্রোতে উদ্ভাসিত হয়ে স্পষ্ট রূপ পাচ্ছে তার অভিব্যক্তি। সাবিত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নায়কের স্তিমিত, নিভৃত অন্তর্জগতে বারবার স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত টুকরো টুকরো অজস্র অসংলগ্ন, কিছু মুহূর্তের সমাবেশ। সেই মুহূর্তগুলোকে কেন্দ্র করেই চলছে নায়কের আত্মসমীক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণ। যার দ্বারা পাঠকের সামনে সাবিত্রীর চরিত্র এবং বুদ্ধিজীবী খগেনবাবু এবং অন্তঃসারশূন্য সাবিত্রীর অসামঞ্জস্যে ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হতে থাকে। যেখান থেকে লেখকের বক্তব্যের মূল অভিব্যক্তির সার্বিক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাত্যহিক জীবনে বড়-ছোট, তুচ্ছ, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, স্মৃতিমধুর, হৃদয়বিদারক অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু জীবন থেমে থাকে না অবাঞ্ছিত ঘটনার বিমর্ষতাকে আঁকড়ে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ঘাত-প্রতিঘাতের ঘাট পেরিয়ে জীবনের গতি শুধু সামনের দিকে। অর্থাৎ পরীক্ষা দিতে দিতেই জীবনের মূল্যায়ন করতে হয়। এই সত্যটিই ধূর্জটিপ্রসাদের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে। আবার বহির্বাস্তবের সম্মুখীন জীবন কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক যাবতীয়কে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলে। তারপরও ঘটনার প্রতিক্রিয়াজাত চিন্তাস্রোতে নিভৃত একাকী মনে চলতে থাকে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। যা চলে অন্তঃশীল প্রবহমান গতিতে,

প্রচ্ছন্নভাবে নিম্ন মনের গহনে ধারণ করে রাখে স্পর্শকাতর যন্ত্রণাকে। যা বহির্জীবনের ভিড়ে বেরিয়ে আসে না, আসে একাকী নিভৃত স্তব্ধতায়। কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেমনটি হয়েছে সাবিত্রীকে কেন্দ্র করে খগেনবাবুর ক্ষেত্রে। মৃত সাবিত্রীর শব-পোড়ার গন্ধ ও উনুনে ভাত রাঁধতে চুল পোড়ার গন্ধ একাকার হয়ে খগেনবাবুর মনের অন্তঃস্থলে উদ্ভাসিত হয়েছে সাবিত্রী। দাঁড়ি কামানোর সময় তিনি চলে যাচ্ছেন পনেরো বৎসরের কৈশোরকালে। চুরি করে প্রথম দাঁড়ি কামানো ও বিবাহের বিকালে দাঁড়ি কামানোর মধ্যে। আবার মুখ ধুতে ধুতে চলে আসছেন চলমান বর্তমানে। অন্তঃশীলায় দেখি টুকরো টুকরো, এলোমেলো, অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন সব মুহূর্তের গ্রন্থনায় চিন্তা-চেতনার একটি সার্বিক রূপ স্পষ্ট হচ্ছে। এই লক্ষণগুলো চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রাথমিক শর্ত। যা অন্তঃশীলার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে stream of consciousness বা চেতনাপ্রবাহ রীতির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রযোজ্য মনে হয়।

→ চেতনাপ্রবাহ রীতির মধ্যে কিছু অসংলগ্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রের চিন্তা-চেতনায় মানসিকতায় আপাত বিশৃঙ্খল আচরণ প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রকাশ পায়। J. W. Beach তাঁর 'The Twentieth Century Novel' গ্রন্থে বলেছেন যে –

> "*Our psyche is such imperfectly integrated bundle of memories sensations, and impulses that unless strenly controlled by some dominating motive it is likely to be at the mercy of every stray wind of suggestion.*"[১৪]

→ কোনও বিশেষ একটি চরিত্র বা মানব মনের চৈতন্যলোকে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হতে থাকে। সেখানে চরিত্রের মানসিক অভিযাত্রা লক্ষ করা যায়। যার অন্তঃকরণে বিভিন্ন চরিত্র ও তার চেতনা ও বিশেষ রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চরিত্রের চিন্তাস্রোতে ও ভাবনার মাধ্যমে উপন্যাসের বিষয়বস্তুগুলোও উদ্ভাসিত হতে থাকে।

→ চেতনাপ্রবাহ রীতি কয়েকটি আঙ্গিক বিশিষ্ট। এই আঙ্গিকগুলি যথাক্রমে — Direct interior monologue, indirect interior monologue, omnicient description, flash back – অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্বগতোক্তি, পরোক্ষ স্বগতোক্তি, আত্মালাপ এবং রোমন্থন পদ্ধতি। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে ব্যবহৃত এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কিছুটা চলচ্চিত্রের ধরন দেখা যায়।

"*A basic device for the cinema is that of montage, among the secondary devices are such controls us multiple-views 'slow ups', 'Fade outs i e cutting', 'close ups', 'panaroma' and Flesh Backs.*"[১৫]

বিশেষত সময় ও অবস্থান এবং তার মধ্যের ব্যবধান বোঝাবার উদ্দেশ্যে এই আঙ্গিকগুলো ব্যবহার করা হয়। বিশেষ একটি মানুষের মানসযাত্রার মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানোই এই রীতির মূল উদ্দেশ্য। ফ্রয়েড এবং ইয়ুং প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদদের অবচেতন স্তরের ধারণাকে গ্রহণ করেই ইউরোপীয় সাহিত্যে এই নব্যরীতির সূচনা। জেম্‌স জয়েস এর 'ইউলিসিস', ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'মিসেস ডেলওয়ে', প্রুস্তের 'রিমেনব্রেন্‌স অব দি থিংস পাস্ট' প্রভৃতিতে প্রথম চেতনাপ্রবাহের এই নব্যরীতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। জয়েস্ এর 'ইউলিসিস' বিশেষভাবে চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস রূপে আখ্যায়িত। জয়েস্ এর উপন্যাসে 'Epiphany' নামে একটি আঙ্গিকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। Leon Edel নামের ব্যাখ্যায়িতা Epiphany-এর সংজ্ঞায় বলেছেন —

"*Epiphany means a sudden spiritual manifestation. Whether in the vulgarity of speech or in a memorable phrase of mind.*"[১৬]

অর্থাৎ মনের গভীর বা অবচেতন মনে গচ্ছিত কোনও ভাবনা বা কোনও স্মরণীয় মুহূর্ত হঠাৎ প্রকট হয়ে ওঠে। সেটা যেকোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করেও হতে পারে। বা কোনও বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়ও হওয়া সম্ভব।

বাংলা সাহিত্যে প্রথাগত সমস্ত ধারণা বা রচনাশৈলীর বিপ্রতীপে বিশ্বসাহিত্যের সামঞ্জস্যে ধূর্জটিপ্রসাদ চেতনাপ্রবাহ নামক নব্য রীতির সূচনা করলেন। অনেক মননঋদ্ধ সমালোচকগণই অন্তঃশীলাকে প্রথমাবস্থায় চেতনাপ্রবাহী রূপেই আখ্যায়িত করেছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী অন্তঃশীলার বিচারে স্বপক্ষে বক্তব্যে বলেছিলেন –

"*বইখানির গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক না হলেও, বঙ্গসাহিত্যে নতুনতর। Virginia Woolf-এর Mrs. Daulloway-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়কই প্রধান বক্তা বা মূল গায়েন। অন্যান্য চরিত্র দোহার মাত্র। বাহ্য ঘটনাও*

মেজরাফের মতো কেবল মনের তারে অনুরণন তোলবার জন্য যতটুকু থাকা আবশ্যক, তাই আছে।"[১৭]

অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের সময়োপযোগী নবাবিষ্কারের যথার্থের সঙ্গে সহমত ধূর্জটিপ্রসাদ। প্রুস্ত, জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্, রিচার্ডসন প্রমুখের নব্যরীতির (চেতনাপ্রবাহের) পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই পদ্ধতির দিক থেকে সম্পূর্ণ মৌলিক না হয়েও প্রথাগত বাংলা সাহিত্যের ধারার বিপ্রতীপে, নিজস্ব বিষয়বিন্যাস ও ক্ষুরধার চিন্তার আলোকে বাংলার ধারায় নতুনতর সূচনা তা একবাক্যে স্বীকার্য। আর অন্তঃশীলার আঙ্গিক যে গান এবং যন্ত্রসংগীতের সে বিষয়েও সমালোচক কিছুটা দিকদর্শন করেছিলেন। নায়ক খগেনের ব্যক্তিগত একটি আকস্মিক মর্মান্তিক ঘটনা, স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহননের প্রতিক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয়েছিল তার চেতন-অবচেতনে চিন্তাসূত্রগুলির গ্রন্থনা। যা খগেনবাবুকে নিয়ে গেছে কখনও রোমন্থনে মনের গভীরে স্মৃতির অতলে। আবার বাহ্যিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি ফিরে এসেছেন চলমান বর্তমানে। এভাবে তার মানসযাত্রায় চলেছে অতীত ও বর্তমানের কিছু মুহূর্তের দ্বিরালাপ। অন্তঃশীল প্রবাহে বা স্রোতে বর্তমান ঘটনার প্রতিক্রিয়ার সমীক্ষণ। খগেনবাবু এবং সাবিত্রীর অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাম্পত্যের বিশ্লেষণ। যেখান থেকে কিছু মুহূর্তের উদ্ভাসনে গ্রন্থপ্রিয়, আত্মসচেতন, বুদ্ধিবাদী চিন্তাশীল খগেনবাবু ও সন্দেহপ্রবণ, অনুকরণপ্রিয়, অরুচিশীল সাবিত্রীর চারিত্রিক ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলো পাঠকের সামনে ক্রমে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ মূল বক্তব্য বা গানটি গেয়ে চলেছেন নায়ক এবং তারই মাঝে মাঝে অন্যান্য চরিত্র রমলা, সুজন-বিজনের উপস্থিতি। নায়কেরই প্রশ্নে, প্রতিপ্রশ্নে, স্মৃতিতে জীবনস্রোতের বাদ্যযন্ত্রে অনুরণিত হচ্ছে।

সমালোচকের বিচার, বিশ্লেষণ ও মানদণ্ডের প্রত্যুত্তরে দেওয়া লেখকের মন্তব্যে আরও স্পষ্ট হয় যে —

> *"অন্তঃশীলার আঙ্গিক সঙ্গীতের, যন্ত্রসঙ্গীতের। বিদেশী সঙ্গীতে বিশেষতঃ fugue-এর, যাতে subject, একাধিক counter-subject থাকে, একটি অন্যটির জবাব, মাঝে মাঝে ভাব হচ্ছে, মাঝে মাঝে ঝগড়া। গড়ে তৈরি হচ্ছে রূপ নয়, style ; Bach's fugues are not a form but a style – মন্তব্যটি বিখ্যাত। তাতে counter point আছে — যেন কার্পেট বোনা হচ্ছে। সাহিত্যে vertical কিম্বা Block harmony চলে না — চলে horizontal*

harmony, যেটা উপভোগ করা বাঙালীর পক্ষে শক্ত নয়, ভাবতাম।"[১৮]

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই ছিলেন একজন সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। সব বিষয়ে মৌলিক চিন্তা-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিটি বিশ্বসাহিত্যের সামঞ্জস্যে এবং কালোপযোগী সাহিত্যের তাগিদে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি সঙ্গীত এবং সাহিত্যের মধ্যে একটি সাদৃশ্য অবলোকন করেছিলেন। কারণ হয়ত সঙ্গীতে মানুষের অন্তরমনের অবচেতনের গূঢ় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে থাকে। যেখানে জীবনদর্শনের মূল তাৎপর্যটুকু কথা ও সুরের মেলবন্ধনে সংগতি রক্ষা করে। আমাদের দেশে, আউল, বাউল, দরবেশ এবং লোকসাহিত্যে লোকগীতির মাধ্যমে এক একটি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও বিশেষভাবে জীবনদর্শনের তাৎপর্যের আভাসটুকু পেয়ে যায়। সংগীতই তার ছন্দে-ছন্দে, গানে, সুরে ধীর লয়ে, আবেগে, অনুভূতিতে নিজের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতিকে ধারণ করে। আর সাহিত্যেও মানবজীবনের সামগ্রিক জীবনদর্শনের তাৎপর্য সন্ধানে, নিরীক্ষণে জীবনের মূল স্রোতকেই ধরার চেষ্টা করা হয়। লেখকের কথায় তার কুলকুল ধ্বনিতে বিভিন্ন আবর্তে জীবনের মোহানাভিমুখে যাত্রা করে চলে। তাই জীবন ও সঙ্গীতের প্রাথমিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তার গতিতে স্রোতস্বিনী প্রবাহে। এ বিষয়ে লেখকের অভিমত –

> *"আধুনিক সাহিত্যে সঙ্গীতের আঙ্গিক গৃহীত হয়েছে – বাংলা সাহিত্যে কেন হবে না? এটা অনুকরণ নয় – সাহিত্যের নিজের তাগিদ। চিত্রের চেয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে তার মিল বেশি।"*[১৯]

বাংলা সাহিত্যে কেন হবে না,– এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিচারেই ধূর্জটিপ্রসাদ যেন সময়ের ক্রমবিবর্তনে, সাহিত্যের তাগিদে, যথার্থ আধুনিক মননে-চিন্তায় সচেতনভাবে তাঁর সাহিত্যে সংগীতের আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে প্রগতিবাদীরা নতুনত্বের সূচনা করেছিলেন, বাস্তববাদী সাহিত্য রচনার আঙিনায় সত্যি। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ সূক্ষ্ম মনন ও জ্ঞানের বিচক্ষণতায় স্বকীয় মৌলিক নতুনত্বের কোনও ভাববীজের সন্ধান পাননি নতুনদের রচনায়। চিত্র নয়, বরং সংগীতের সঙ্গেই সাহিত্যের অন্তরঙ্গ সাযুজ্য, এই অভিমতকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর উপন্যাস ত্রয়ীতে। তিনি আক্ষেপের সুরেই বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যে নতুন ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা সেখানে নতুনত্ব কোথায় —

> *"রবীন্দ্র সাহিত্যেও ইমেজ রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেও ইমেজ — তবে নতুনত্ব*

কোথায়?"[২০]

সংগীতের সঙ্গে সাহিত্যের যে সাযুজ্য এবং আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপেই স্থান লাভ করেছিল। বিদেশি সাহিত্যেই এর সূচনা। অনেক সমালোচক ভার্জিনিয়া উলফ্ এর 'The waves' 'To the lighthouse'; এবং জয়েস-এর 'ulysis' এর মধ্যে সাংগীতিক ও সাহিত্যিক সাদৃশ্যের লক্ষ করেছেন। এবং তাদের পরবর্তী রচনাসমূহেও তার প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক ব্যক্তিজীবনেও সচেতনভাবেই এই মননশীল সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের রচনাগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এবং বাংলা সাহিত্যে মৌলিকভাবে নতুনত্বের ভাবনা তার মনে উদিত হয়েছিল। তারই প্রতিকল্প নির্মাণে তিনি সচেতনভাবেই নতুন ভাবনায় নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাসন করলেন। সংগীত এবং সাহিত্যের সাদৃশ্যের ভাবনায় ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট করেছিলেন সংগীতজ্ঞ ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক টমাস মান্, তাঁর 'The magic mountain' গ্রন্থে—

> "*Music and narration are alike, in that they can only present themselves as a following, as a succession in time, as one thing after another, and both differ from the plastic arts, which are complete in the present, and unrelated in time ...*"[২১]

মনে হয় ধূর্জটিপ্রসাদ চেয়েছিলেন খাঁটি আধুনিকতা এবং স্বতন্ত্র ভাবনার রীতির আধুনিক সাহিত্য। তাই প্রচলিত এবং প্রগতিবাদীদের আধুনিক সাহিত্য পদ্ধতির মাত্রাকে প্রত্যাখ্যান ও অতিক্রম করে গিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসেই উপন্যাসের বিষয়, রীতি এবং আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভাবনা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাসের আঙ্গিককে সঙ্গীতের রূপকল্পে মেলাতে চেয়েছিলেন ভাষা এবং সত্তার পার্থক্যকে বোঝানোর জন্য। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে প্রধানত একজন বুদ্ধিজীবীর মানসিক অভিব্যক্তির যাত্রা সূচিত হয়েছে যার মূলস্রোত প্রবাহিত হয় মনের অবচেতন স্তরকে কেন্দ্র করে। তাই তার ভাষারও একটা নিজস্ব গতিতে নতুন রূপ ও প্রকাশ পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে। অবচেতন মনের গহনে নিভৃতে, একাকী যখন মূলস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে প্রচ্ছন্নভাবে সেখানে সত্তার সমস্ত পূর্বাভিজ্ঞতা স্মৃতি-বিস্মৃতি, অনুভূতি, বেদনা, আনন্দানুভূতি, বিচার-বিশ্লেষণ, আত্মনিরীক্ষণে ব্যাপৃত হয়। যা হয়ত ভাষা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। কারণ তা ভাষাকেও ছাড়িয়ে অন্য কিছু। ভাষা দিয়ে কোনো ব্যাপারে

বোঝানো যায়। কিন্তু অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা একান্ত নিজের পক্ষেই সম্ভব। সত্তা এবং অপরতার পার্থক্য এখানেই প্রযোজ্য। আবার সত্তাও সম্পূর্ণতা পায় সমগ্রের অন্বয়ে। সে একাকী কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাখতিনীয় এই তত্ত্বসূত্র উপন্যাস পর্যালোচনায় আমাদের তাই পথনির্দেশক হয়ে ওঠে। গান-সাহিত্য-জীবন-মানুষ যাই হোক, তাকে একান্ত করেও অপরতার বা সমগ্রতার উপস্থিতিতেই মান্যতা দিতে হয়। তাই বলা যায়, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুজনে। একজন গাহিবে ছাড়িয়া গলা আরেকজন মনে মনে'। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট চরিত্র খগেনবাবু ও রমলার পত্রালাপেই সঙ্গীত, জীবন, সত্তা এবং ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি উদ্ঘাটন করে দিতে চান, —

> *"মনের উপর ভাষার আধিপত্য না সরালে সঙ্গীতের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ সেই কথিত ভাষা ভিন্ন অন্য কি উপায় আছে বোঝাবার? স্বীকার করি সেটা ব্যাখ্যার পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়, সে জন্য সুরের ভাষারই প্রয়োজন, অতএব সুরকে অব্যক্ত বলে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। . . . গানই বলুন, মানুষই বলুন, আর সাহিত্যই বলুন, শুদ্ধভাবে দেখার অর্থ – বস্তুর সত্তা বোঝা – বোঝা নিজের সমগ্রতা দিয়ে। যখন ভাষাকেই সত্তা বিবেচনা করি। এর চেয়ে ভুল আর নেই। বাক্যে সব ধরা পড়ে না – এবং সত্তা এবং প্রকাশ এক বস্তু নয়। ভাষা কেবল ওপরের ভাসমান ও দৃশ্যমান অংশটুকু। চারভাগের তিনভাগ থাকে নেপথ্যে। তাকে প্রকাশ করতে হয় সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে। সমগ্র এই কারণে যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে তৎসদৃশ ভাষাতিরিক্ত অবচেতনা ও ঊর্ধ্বচেতনা রয়েছে।"*[২২]

প্রতিবেদনে একজন পুরুষের অবচেতন মনকে কেন্দ্র করে মানস পরিবর্তনের ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্তকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চেতনাপ্রবাহী রীতির আলোকে সাঙ্গীতিক বিন্যাস লেখকের সচেতন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে প্রাথমিকভাবে প্রথম সার্থকতা লাভ করেছে বলা যায়। লেখক বলেছিলেন অন্তঃশীলার আঙ্গিক সঙ্গীতের, পাশ্চাত্য Fougue-এর। উপন্যাসের আরম্ভ নায়কের স্ত্রী সাবিত্রীর অপমৃত্যু এবং তারই কারণে পুলিশ কোর্ট, কোর্টের রায়, ময়নাতদন্তের মর্গ, অর্থাৎ subject এবং counter-subject, একাধিক। একটি অন্যটির জবাব। subject রূপে যদি ধরি বুদ্ধিবাদী খগেনবাবুর অত্যধিক বুদ্ধিবাদীতা, গ্রন্থপ্রিয়তা

এবং খুঁটিনাটি ভুল-শুদ্ধের মানদণ্ড বিচার এবং স্ত্রী সাবিত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত উপস্থিতি, সন্দেহপ্রবণ, ঈর্ষাকাতর ভাব। তার ফলে খগেনবাবু ও সাবিত্রীর অসামঞ্জস্য দ্বন্দ্বময় ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের পরিণতি সাবিত্রীর অপমৃত্যুতে। মূল subject যদি হয় সাবিত্রী তাহলে তাকে বা সাবিত্রী প্রসঙ্গকে ঘিরেই মাসীমা এবং রমলা counter-subject রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের মধ্যে তুলনা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্রের বিচারে একটি অপরটির জবাব হয়ে উঠেছে। আত্মমুখী, আত্মম্ভরী নিরালম্ব খগেনবাবুর মানসক্রিয়া যদি subject হয়, তাহলে প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিত্বময়ী, সংযমী সংযোগী স্ত্রী চরিত্র রমলা এবং সুজন ও বিজন counter-subject রূপে উপস্থিত। উপন্যাসের সূচনায় আত্মমগ্ন অবস্থায় (সুষুপ্তি) করোনারের কোর্টে খগেনবাবুকে অবলোকন করা যায়। রায় ঘোষণার সময় উকিলের ঝাঁকুনিতে খগেনবাবু চেতন অবস্থায় ফিরেন। তারপরও তার অন্যমনস্ক ভাবপ্রবণতা, যা এই অবস্থায় অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। করোনারের কোর্টের পর মর্গ, শ্মশানযাত্রা সাবিত্রীর আত্মহত্যার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো বা বলা ভাল কিছু কিছু মুহূর্ত খগেনবাবুর আত্মগত চিন্তায়, মানসপটে উদ্ভাসিত ও বিশ্লেষিত হতে থাকে। যা চেতনাপ্রবাহ রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে অভিহিত।

চেতনাপ্রবাহ রীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নির্ভর করে ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলায় কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে। উপন্যাসের কিছু উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করেই তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বহির্বাস্তবের একটি ঘটনা স্ত্রী সাবিত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বর্তমান থেকে অতীতে, মানসপটে ভেসে উঠেছে অজস্র অসংলগ্ন মুহূর্ত, বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ। মৃত স্ত্রী সাবিত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই খগেনবাবু লক্ষ করলেন —

> ‘‘হাতের চুড়িটা ঢলঢলে হয়েছে, গলার হারটা উলটে গিয়েছে। একদিন না খেলেই রোগা হয়ে যেত বেচারি দুদিন খায়নি। খগেনবাবু ধীরে ধীরে হারটা গুছিয়ে সোজা করে দিলেন। এই হার নিয়ে একবার দীর্ঘ অভিমানের পালা হয় তাদের মধ্যে।’’[২৩]

এভাবে খগেনবাবু একটি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে স্মৃতির আবহে মনের অতলান্তে প্রবেশ করছেন। সাবিত্রী খগেনবাবুকে বলেছিল হারটি পরলে সবাই প্রশংসা করে ভাল দেখায় বলে। কিন্তু স্বামী খগেনবাবু একবারও মুখ খুলে এই কথা বলেন না। এতে খগেনবাবু বলেন, না পরলেই আরও ভাল দেখায়, তাই

তিনি বলেন না। এতে রাগারাগিতে সাবিত্রীর হাতে হারের পিনটা খারাপ হয়ে যায়। হারটি সারাবার জন্য স্যাকরা বাড়িতে এলে সাবিত্রীর কাছে খগেনবাবু জানতে পারেন তা ঠিক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সাবিত্রীর বান্ধবী রমলার পরিচিত কোনও এক স্যাকরার দোকানে। এই কথায় খগেনবাবু অভিমানের ভান করে বসেন। আর তাতে সাবিত্রী অদ্ভুতভাবে প্রসঙ্গ টেনে আনে অরুচিকর কথা বলে। তাতে তার সন্দেহপ্রবণ, ঈর্ষাতুর চারিত্রিক রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

> *"পরের বউ এর গয়না ভেঙে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, আমার জন্য কোন কষ্ট করতে হবে না। খগেনবাবুর এক বন্ধুপত্নীর কোন এক গহনা খারাপ হয়ে যায়, পথে স্যাকরা বাড়ি পড়ে, তাই গহনাটা স্যাকরা বাড়ী পৌঁছে দেন, স্যাকরাটি রমলা দেবীরই আশ্রিত লোক। কথা বেশ হেঁটে বেড়ায়। ঘটনাটি মনে পড়তেই খগেনবাবু উঠে পড়লেন।"*[২৪]

মৃত পাংশুবর্ণ সাবিত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিগোচর হতেই খগেনবাবু নিজের নিভৃত মনে অতীতের স্মৃতিচারণায় হারিয়ে গেলেন। আবার রমলার প্রসঙ্গ আসতেই এবং পূর্বস্মৃত ঘটনা সমাপ্তির দিকে এগোতেই তিনি 'উঠে পড়লেন'। অর্থাৎ অন্তর্লোকের মানসযাত্রা থেকে চলমান বর্তমানে তার পদার্পণ ঘটল। এই যে চেতন এবং অবচেতন মনের আসা-যাওয়া, এখানে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগে উপন্যাস সার্থকতা অর্জন করে। আবার সাবিত্রীর শবদাহের সময় যখন চুল পুড়ে গন্ধ বেরুচ্ছে, 'একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফেন পড়ছে।' তখন খগেনবাবুর অন্তঃস্থল আবার পৌঁছে গেছে অতীতের কোনও মুহূর্তে। একবার রাঁধতে গিয়ে সাবিত্রীর চুল পুড়ে যায়। তখন খগেনবাবু বলেছিলেন, যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না। এই কথায় সাবিত্রী ভীষণ রেগে খগেনবাবুকে বেরিয়ে যেতে বলে।

> *"চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে। . . . প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতে লাগল . . . বিশ্রী ধোয়া হঠাৎ দড়াম করে একটা কাঠ ফাটল। চমকে উঠলেন খগেনবাবু।"*[২৫]

খগেনবাবু আবার ফিরেন বর্তমানে। এভাবে এক একটি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ভাসমান অবস্থায় নিভৃত মনে আসা-যাওয়া। এরই ফাঁকে ফাঁকে অন্তঃশীলার গতিস্রোত, বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন হয়েও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। সাবিত্রীর বিষপান করে মরার ঘটনায় খগেনবাবুর অন্তর্জগৎ বারবার অতীতচারী

হয়েছে। একবার খগেনবাবুর বাড়িতে বেড়াতে আসা সম্পর্কীয় বোনের গানের প্রশংসা করায় ঈর্ষাতে সন্দেহে সাবিত্রী বিষ খেয়ে মরার ভয় দেখিয়েছিল। খগেনবাবু মনে মনে বলছেন আজ সে বিষ খেয়েছে অতি তুচ্ছ কোনো কারণে। কারণ পাঠকের সামনে স্পষ্ট নয়, যদিও একটু ইঙ্গিত আছে রমলা ও খগেনবাবুর সম্পর্কে সন্দেহে হয়ত সাবিত্রীর এই পদক্ষেপ। কিন্তু খগেনবাবু মানসপটে উদ্ভাসিত বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা, মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাবিত্রী চরিত্র। সাবিত্রীর সন্দেহপ্রবণ মন, ঈর্ষাতেই বিপরীত মোটাবুদ্ধির ফলেই সে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে তা বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে লেখকের চিন্তাশীল বিবরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চেতনাপ্রবাহ রীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বগতোক্তির ব্যবহার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যা এই উপন্যাসে অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। লেখক বা নায়কের মনোবাচনে যা লক্ষণীয়। কিছু কিছু উক্তি উল্লেখনীয়।

→ মাতৃগর্ভে অন্ধকার, কবরের মধ্যে অন্ধকার; মানুষ সীতার সন্তান, সীতাই হলেন আদিম মাতা। (পৃঃ ৭২)

→ সাবিত্রী স্বধর্মেই যদি আত্মনিধন করত তা হলে কোন আপত্তি ছিল না। পিন এ আটকান মরা প্রজাপতি হওয়ার চেয়ে মরা গুটি হয়ে রেশমের যোগান দেওয়া ঢের বেশি সামাজিক কাজ। (পৃঃ ৭২)

→ রমলা দেবী মোটর চড়ে এসেছেন . . . এ দুদিন খুবই করেছেন অবশ্য, কিন্তু আজ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করা উচিত হয়নি। (পৃঃ ৬৯)

→ একদিন না খেলেই রোগা হয়ে যেত, বেচারি দুদিন খায়নি। (পৃঃ ৭৪)

→ এদেশে ও সমাজে, এ যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত। (পৃঃ ৭৫)

→ তোমার আত্মা যদি থাকে তবে তার তৃপ্তি হোক। (পৃঃ ৭৭)

→ পরজন্ম যদি থাকে তাহলে সাবিত্রী যেন মেয়েমানুষ না হয়ে জন্মায়, বাঙালি হিন্দু পরিবারের মেয়ে হওয়ার চেয়ে পশুজন্মও বোধ হয় ভাল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী আত্মঘাতিনীর মানবজন্মও হয় না। মেয়েদের আত্মা! হিন্দুশাস্ত্রেই আছে —, (পৃঃ ৭৭)

→ সৌন্দর্যটাও নিজস্ব বস্তু, রমলা দেবীকে যা মানায় সাবিত্রীকে তা মানায় না। (পৃঃ ৭৯)

→ ছেলেমেয়েই হয় না এদের, অবশ্য না হওয়াই ভাল। রমলা দেবীরও হয়নি, সাবিত্রীরও না। (পৃঃ ৭৯)

→ রমলা দেবী কী বাড়ীতেও জুতো পরেন না কি? চাপলি পরেন নিশ্চয়ই, চাপলির শব্দ অন্য ধরনের। (পৃঃ ৮০)

→ তাঁর রুচি বিদেশী; তাও বিদেশের মার্জিত রুচি নয়, সে রুচি কয়েক বৎসর পরে জাহাজের খোলের বন্ধ হাওয়ায় ভেপসে উঠে পচা অবস্থায় ভারতবর্ষে হাজির হয়। (পৃঃ ৭৯)

→ সত্য হ'ল সহজ ও স্বাভাবিক, ভদ্রতা হ'ল অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। (পৃঃ ৮১)

উল্লেখিত উক্তিগুলো ছাড়া আরও অনেক উক্তি লক্ষ করা যায়। চেতনাপ্রবাহ রীতির সচেতন ব্যবহার উক্তিগুলোর মাধ্যমে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। এই উক্তিগুলোর মধ্য দিয়েই লেখক বা নায়কের জগৎ-জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ কঠিন, সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণায় দার্শনিকসুলভ বুদ্ধিবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। যা লেখক ও নায়কের যুগ্ম মানসিক ও চারিত্রিক স্বরূপটির উন্মোচনে সহায়কও হয়ে উঠেছে।

অন্তঃশীলা উপন্যাসের আঙ্গিক বা রীতিতে লেখকের সচেতন প্রয়াসে বিষয়বিন্যাসে নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায় একথা অনস্বীকার্য। চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রাথমিক কিছু বৈশিষ্ট্যগুণে তার নিজস্ব রূপ-গঠন তৈরি হয়েছে। একজন 'ইনটেলেকচুয়ালের' মানসিক, বাহ্যিক, চিন্তা-চেতনায়, স্মৃতি রোমন্থনে বিচার-বিশ্লেষণমূলক রীতিতে অন্তঃশীলার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। লেখক প্রচলিত সমস্ত রূপ-রীতির বিপ্রতীপে নতুনত্বের আস্বাদের কথা ভেবেছিলেন। সেখানে সাহিত্য ও সাঙ্গীতিক ধর্মের সাযুজ্য প্রমাণ করেছেন নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে। নতুন আঙ্গিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (methodology) গ্রহণে তাঁর সৃষ্টিকে সুষমামণ্ডিত করতে কোনও প্রচেষ্টা বাকি রাখেননি। জীবন একটা গতি, স্রোত, যার প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন। জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত অনেক অপঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু তার ফলে জীবনস্রোত থামে না। মানুষ আপাত বিচলিত হয় কিন্তু তার মানসভূমিতে চিন্তাস্রোত, ভাবনা চলতেই থাকে। তা সাধারণ এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে, এই পার্থক্য। হয়তো সেখানে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন ভাবও দ্যোতিত হতে পারে। যা চেতনাপ্রবাহেরই বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। কিন্তু এটাই আসলে জীবন, এটা প্রক্রিয়া। জীবনস্রোত যা থামে না, যা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের ধার ধারে না। স্মৃতিকে ঘিরে থাকে মন-চেতনা। কিন্তু জীবনের চলমান গতিতে তা বিবর্তিত হতে বাধ্য। এটা স্পষ্ট হয় লেখকেরই বা নায়কেরই

বক্তব্যে –

> *"কতদিন স্মৃতির পুঁজি নিয়ে চলবে? কলসির জল গড়াতে গড়াতে খালি হয়; স্রোতের জল খালি হয় না; জোর আসে ভাঁটা। গচ্ছিত ইতিজগৎ। এই দু'দিন আগে সাবিত্রী ছিল, আজ নেই। কিন্তু সূর্য বেশ উঠছে। সেই সূর্য থেকে আহৃত জীবনও রুদ্ধ হয়নি। যেমন ভূমিকম্পে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। জীবনটা ঘড়ি নয়। জীবনপ্রবাহকে স্বীকার করতেই হয়।"*[২৬]

অন্তঃশীলা রচনার মূল উদ্দেশ্য একজন মানব মনের গচ্ছিত অভিব্যক্তিকে চিন্তাস্রোতের বিবরণে প্রকাশ করা। যা একমাত্র সম্ভব ছিল চেতনাপ্রবাহ রীতি-পদ্ধতির ব্যবহারে। লেখক তাতে সচেতনভাবেই প্রয়াসী হয়েছিলেন। মানসিক অভিব্যক্তির নিদর্শন তৈরিতে, নতুন ভাবনায়, চিন্তা-চেতনায় চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রায় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য আপাতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তত্ত্বকথার চুলচেরা বিশ্লেষণে হয়তো কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সমস্ত পূর্বপ্রথার সাহিত্যিক সন্দর্ভ নির্মিতির বিপরীতধর্মী প্রতিসন্দর্ভ (counter-discourse) নির্মাণ করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। এখানে তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে এক একক পথিক, পথনির্দেশক। তিনি ইচ্ছাপূরণের কাহিনি লেখেননি। বরং স্বতন্ত্র আধুনিক সাহিত্য নির্মাণের পদ্ধতিকেই যেন তুলে ধরেছেন। পাঠক যখন চিত্তবিনোদন, আনন্দ উপভোগপ্রবণ সাহিত্য পাঠের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে, জীবনের যথার্থতা বিচারে নিরেট তাৎপর্য সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হবেন। তখন ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের ধরন নিজস্ব গঠন ও নতুনত্ব সন্ধানী ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনই সহায় হয়ে উঠবে। প্রথাগত সমস্ত আকল্পের ও রীতির বিপরীতে আকল্প নির্মাণে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পথ প্রদর্শক রূপে। রোলা বাঁর্ত কথিত, Every Text has a pretext এর নমুনা হয়ে উঠবে এই প্রতিবেদন ত্রয়ী। এবং পরবর্তী পাঠকৃতি (Text) এর পূর্বসূরির ভূমিকা পালনে সক্ষম থাকবে। এবং ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস স্বল্প পাঠকের গণ্ডি পেরিয়ে আপামর সচেতন পাঠকের আগ্রহ আকর্ষণ করবে। অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই বলেছিলেন –

> *"একজন খাঁটি আধুনিকের মতো কখনো কখনো ধূর্জটিপ্রসাদের হাতে উপন্যাসের রীতিই হয়ে উঠেছে উপন্যাসের বিষয়।"*[২৭]

মানুষ সমাজ ও সময়ের দ্বন্দ্বময় জটিলতায় বা অত্যধিক বুদ্ধিবাদের ফলে কোনও কোনও সময় বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। তখন তার মধ্যে আস্তিত্বিক সংকট সৃষ্টি হয়। অস্তিত্বও একক উপস্থিতি নয়, বরং

সত্তা ও অপরতার পরিপূরকতা তার কাম্য। স্বতন্ত্র হয়েও তাকে অন্বয় সাধন করতে হয় সমগ্রের উপস্থিতি গ্রহণ করে। ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে সমাজ-জীবনের প্রেক্ষিতে যে-দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছিল তাতে মানুষের অস্তিত্ব সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। একদিকে মতবিরোধ, সামাজিক অস্থিরতা, অন্যদিকে তথাকথিত অত্যধিক বুদ্ধিবাদ, পশ্চিমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যা ধূর্জটিপ্রসাদের বিবেচনায় individual, অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক, person নয়। এই প্রভাবগুলোর ফলে দ্বান্দ্বিক জীবনযাত্রায় আস্তিত্বিক সংকট অনুভূত হয়েছিল। এই সমস্যা আর জীবনকে পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্যই একজন বুদ্ধিবাদী চরিত্রের মানসিক অভিব্যক্তিকে লেখকের আধেয় করতে হল হয়তো। আর এই সংকট সমাজ ও বিবর্তনশীল সময়ের দ্বন্দ্বে, যেকোনো কালে সংঘটিত হতেই পারে। তাই এটা চিরন্তন সমস্যারই নামান্তর। লেখকেরও বিশ্বাস সাহিত্যের সামগ্রী হবে চিরন্তন সমস্যার ধারক। এবং মানসিক অভিব্যক্তির পরিস্ফুটতায় বাহ্যিক জীবনপ্রণালীর চেয়ে অন্তর্লোকের যাত্রাই মুখ্য। যা একমাত্র সম্ভব চেতনাপ্রবাহ রীতির ব্যবহারে। যা লেখক সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিতভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন। তাই প্রথাগত বাংলা উপন্যাসের ধারাকে অতিক্রম করে এর বিপ্রতীপে নতুন রূপ-রীতি ও বিষয়বিন্যাসে অন্তঃশীলা স্বতন্ত্র মাত্রার দাবি রাখে।

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা একটি অখণ্ড চেতনারই তিনটি পর্ব। অন্তঃশীলায় চেতনাপ্রবাহ রীতির বৈশিষ্ট্য বা ব্যবহার লক্ষণীয়। কিন্তু আবর্ত ও মোহানায় সেই রীতি আর সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকেনি। আবর্ত বা মোহানায় অন্তর্লোকের ভাষ্য একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ খগেনবাবুর চারিত্রিক ধাতটিই তৈরি হয়েছিল চিন্তা-চেতনার মনোগ্রন্থিল উন্মোচনের বাহক রূপে। কিন্তু আবর্ততে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগের পরিবর্তে কার্যকারণ সম্বন্ধ, বিবৃতিধর্মিতা লক্ষ করা যায়। সামাজিক ও সাংসারিক সমস্যাবলিও এখানে স্থান লাভ করেছে। কাশী ও হরিদ্বারের পরিবেশ, রাস্তাঘাটের দুর্বিষহ বর্ণনা, আশ্রমের প্রবঞ্চনা ইত্যাদি অনেককিছু আবর্তের বিবৃতিতে তুলে ধরা হয়েছে। বা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুজনের ঠিক করা রমলা দেবীর তেতলা বাড়ির বিবরণে চেতনাপ্রবাহের চিহ্ন অনুধাবন করা যায় না।

মোহানার প্রধান বিষয় মার্কসীয় দর্শনে সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমি। জীবনে বিভিন্ন আবর্তের মুখোমুখি হয়ে, রমলা দেবী এবং খগেনবাবুর আবর্তের শেষে মাসীমার মৃত্যুর পর উভয়ের একত্রে বাস, নৈকট্য ও বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কাশী ছেড়ে কানপুরে এসে খগেনবাবু বিজনের সংস্পর্শে সফীক, মহবুবদের শ্রমিক আন্দোলনে পার্টির কাজে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে আবর্তে কিছুটা

এবং মোহানায় কার্যকারণ শৃঙ্খলার পরিপাট্যে একটি প্রথাগত প্লটও গড়ে ওঠে। আবর্ত ও মোহানার সংক্ষিপ্ত সারাৎসারে দেখা যায় খগেনবাবুর অন্তর্লোকের উদ্ভাসন উদ্ঘাটিত করা হয়েছে কিছু কিছু জায়গায়। কিন্তু তার অবচেতন মনের চিন্তাস্রোতকে ভাসিয়ে তোলার চেতনাপ্রবাহ রীতির অভিপ্রায়টি তেমন স্পষ্ট নয়। এখানে মনোবিশ্লেষণাত্মক রীতি পরিলক্ষিত কিন্তু চেতনাপ্রবাহের মূল রীতির পরিবর্তে বিবৃতিমূলক কথন-রীতির প্রাধান্য ঘটেছে। কিন্তু সচেতন শিল্পীর অভিপ্রায়টি কেন বদলে গেল। নাকি উপন্যাসের বিষয়বিন্যাসেই তার উত্তর লুকায়িত।

আসলে এখানেই ধূর্জটিপ্রসাদের personality তত্ত্বটির সমীক্ষা প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। বুদ্ধিবাদী খগেনবাবু বা 'intellectual type' নায়ক চরিত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে, অকপট চিন্তায়, বিচার-বিশ্লেষণে নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু সে সমাজ-জীবন বা তার কথায় জনসাধারণের ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন। মাসীমার কৃপায়, স্নেহে কর্মজীবন বা জীবিকার প্রয়োজন হয়নি। তাই জ্ঞানসাধনা এবং চিন্তাশীলতাই ছিল জীবনের একমাত্র মাপকাঠি। একদিক থেকে সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সাবিত্রীর মৃত্যু প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তাকে নাড়া দিয়েছে, তাই মাসীমাকে খগেনবাবু বলেন, সাবিত্রী না মরলেও পারত। অন্তঃশীলায় খগেনবাবু আত্মম্ভরী, আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমুখীন এক intellect ব্যক্তি। সাবিত্রীর অপমৃত্যুতে কিছুটা অস্বস্তি তার অজান্তেই তার মধ্যে ঘর করেছে। আর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই খগেনবাবুর রমলা দেবী, স্বল্প পরিবৃত্তে হলেও সুশিক্ষিত সুজন এবং যৌবনউদ্দীপ্ত বিজনের সংস্পর্শে আসা। এবং তার একক সত্তা এই চরিত্রগুলোর সত্তার উপস্থিতিতে, বিপরীত বোধ ও আকর্ষণ অনুভব করেছে। বিশেষত রমলা দেবীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এবং বিপরীত লিঙ্গ হিসেবেও হয়তো খগেনবাবু আকৃষ্ট হয়েছেন। লেখক বলেছিলেন খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া পলায়ন। তাই তিনি রমলা দেবী থেকেই বিশেষত পলায়ন শুরু করলেন। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব, মৈত্রী স্থাপনে জীবনের গতি, এটাও তিনি অনুভব করলেন –

> *''মৈত্রীর মানে জানি না - বন্ধুত্ব বুঝি, সেও একজনের সঙ্গে অন্যজনের সম্পর্ক, সকলের সঙ্গে একের নয়, সকলেরও নয়।' ... মৈত্রী স্থাপনে ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, এটা জনতায় আত্মবিসর্জন নয় - সেই জন্য বৈচিত্র্যও বজায় থাকে।' ... 'সম্বন্ধই সত্তা। আর সেই ভাঙা গড়ার নামই জীবন।''*[২৮]

তাহলে দেখা যায় অন্তঃশীলার শেষেই 'আবর্ত' বা 'মোহানা'র ভাবী বীজ রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল।

কাশীযাত্রার মাধ্যমে আবর্তে লক্ষ করা যায়, এটা খগেনবাবুর আত্মানুসন্ধানের যাত্রা। অন্যভাবে বললে নিজেকে পরীক্ষা করে নেওয়ার পালা। অর্থাৎ এই যাত্রা individual থেকে person এর অন্বেষণে। মূলত কাশীগমন অন্তঃশীলার শেষেই হয়েছিল। তারপর রমলা দেবী ও খগেনবাবুর পত্রালাপে মনোভাবনা আদান-প্রদান, পরস্পরের প্রতি প্রচ্ছন্ন ও অনুচ্চারিত আকর্ষণ তাদের মনোদর্পণে স্বচ্ছতা লাভ করে। তাদের চারিত্রিক অভিব্যক্তি স্পষ্ট রূপে উন্মোচিত হতে থাকে এবং খগেনবাবুর প্রেরিত ডায়েরিতে, রমলা দেবীর পঠনে খগেনবাবুর চিন্তা-চেতনা, রমলা দেবী সম্পর্কে ধ্যানধারণার খোলস ভেঙে পড়ে। বেরিয়ে পড়ে আদর খেতে অভ্যস্ত, ভাবমিশ্রিত কিন্তু দাম্ভিকতায় আঘাতের ভয়ে সংকুচিত খগেনবাবুর স্বীকারোক্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের একাকীত্বের গম্ভীর মূর্তি রমলা দেবীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়ে পড়ে পাঠকের সম্মুখে। রমলা দেবীর একক সত্তাও সম্বন্ধ গড়ার অভিমুখে কাশী যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। দুজনের জীবনে প্রথমে সম্পর্ক ভেঙেছে, আজ আবার গড়ার পালা। তাই অন্তঃশীল প্রবাহে চলতে চলতে যে-আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা রমলা দেবী ও খগেনবাবুর অন্তরেই ঝড় তুলেছে বিশেষ করে।

আবর্তে রমলা সুজনকে নিয়ে কাশী অভিমুখে যাত্রা করেছে। এবং খগেনবাবু কাশী ছেড়ে হরিদ্বার চলেছেন। পথে একবেলার জন্য লখনৌ-এ অবস্থান করলেন। তারপর হরিদ্বার এর আশ্রমে অবস্থান করেন। আশ্রমজীবনের কিছু ভণ্ডামি, অসামাজিক বিধানে খগেনবাবুর আপত্তি হয়। খগেনবাবুর মনে হয়েছিল আশ্রম মানব প্রকৃতির সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে ভয় করে। মানুষের মনকে উন্নত করতে বাধ্যবাধকতা গড়ে। কারণ আশ্রমে আশ্রিত গৃহপরিত্যাগিনী পালিয়ে আসা নিস্তারিণী উর্ফে ভগিনী চন্দ্রাবলী ও ব্রহ্মচারী ভুলুর আকর্ষণ সমাজের চোখে পাপ, গর্হিত। খগেনবাবু এই কথা ভাবতে ভাবতেই সমস্ত ঘৃণা ও ক্রোধ নিজের প্রতিই অনুভব করেন –

> *"সমাজের দোষ আছে, কিন্তু তাই বলে পালিয়ে আসবে। খগেনবাবুর মনে পড়ে তিনি নিজেই তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে উন্নত করতে যান এবং রমলার কাছে থেকে পালিয়ে এলেন, অন্যের পৃথক সত্তা স্বীকার করবার ভয়ে।"*[২৯]

এখন পৃথক সত্তাকে স্বীকার করার জন্যই খগেনবাবুর মন ব্যগ্র ও উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কারণ নিরালম্ব জীবন অসম্ভব মনে হয়েছে তার কাছে। আবর্তে চরিত্রগুলির মধ্যে একটি মোড় এসেছে। কাশীতে অবস্থানরত রমলা খগেনবাবুর জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। আর হরিদ্বারে খগেনবাবুর খুব বেশি জ্বর হয়।

আশ্রমে ঔষধ খাইয়ে আশ্রমকর্তা ব্রহ্মচারী তাকে নিদ্রায় রেখে চলে গেলেন। প্রায় তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙে। জলের তৃষ্ণায় এবং জ্বরের ক্লান্তিতে অস্বস্তিবোধ হতে থাকে। ব্রহ্মচারীকে ডাকতে ডাকতে ঘুমন্ত ব্রহ্মচারীর কথা ভেবে সাবিত্রীর প্রসঙ্গ, রমলার প্রতি ব্যগ্র মন ও অন্তর্লোকের অবগাহনে বিভিন্ন চিন্তা প্রবাহিত হয়। এখানেও অতীত ও বর্তমানের দ্বিরালাপ তৈরি হয়,– অতীত সাবিত্রী এবং বর্তমান রূপী রমলার ভাবনায় উদ্বেল মন,—

> *"রাতে তেষ্টা পেলে জল দিত। কেনই বা আত্মঘাতী হল? নিশ্চয়ই মনে বুঝেছিল যে রমলাই তার জিনিস কেড়ে নেবে ... কিংবা বুঝেছিল তার স্বামী মনে মনে অন্যকে, রমলাকেই চায় ... জিভ নড়েনি স্বীকার করতে যে তার স্বামী রমলার, তার নয়। স্বীকার করা বড় শক্ত, সত্যকে স্বীকার মানে নবজন্ম, তার মানে পুরাতনের মৃত্যু। স্বীকারে বিরোধের অবসান, শান্তি, মিথ্যার মৃত্যু, দ্বিজত্ব লাভ।"*[৩০]

এখন খগেনবাবু পৃথক সত্তা রমলাকে স্বীকার করতে চান। সাবিত্রী আজ নেই, সে পুরাতন তার অবসান হয়েছে। আজ উপস্থিত সত্যকে স্বীকার করেই নবজন্ম ঘটবে আত্মমুখী খগেনবাবুর জীবনে। 'সম্বন্ধই সত্তা', তার এই প্রতীতিকেই রমলার সঙ্গে সম্বন্ধে, সত্তায়-সত্তায় পরিপূর্ণতা পেতে অস্থির তার মন।

> *"হরিদ্বারের গঙ্গার স্রোতে খল খল শব্দ হয়, অ্যানিকাটের জলে স্রোত নেই, শব্দও নেই। তারপর নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হ'ল - তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়, সে প্রতিবাদ করে না, কেবল বলে না, না, না। নেতিধর্ম জীবনের অপমান। এই স্রোতস্বিনীতে জোয়ার আসে সমুদ্র যখন দম্ভের সহিত আপন রাজ্য বিস্তার করে। রমা কি জোয়ার আনবে? কবে?"*[৩১]

আবর্তে প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে একটি নতুন মোড় এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের বিবর্তিত একটি রূপ লক্ষ করা যায়। সুজন ও তার রমলাদি - এর মধ্যে কাশীতে একটি বিবর্তনরেখা সূচিত হয় অক্ষয়ের ঘরের নিভৃত অন্ধকারে। খগেনবাবুর চেতনস্রোতে রমলাকে নিয়ে ভাবনায় যে জোয়ার অনুমেয়, সেই জোয়ার রমলার ভিতরে এসে গেছে। অন্তঃশীলায় সংযমী, গম্ভীর এবং আত্মসচেতন, স্বতন্ত্র যে-ভাবমূর্তি রমলার ছিল আবর্তে তা-ই ইন্দ্রিয়জাত মানবিক সহজাত আকাঙ্ক্ষার সংবরণে ব্যর্থ, খগেনবাবুর জন্য

অস্থির, উদগ্রীব এবং চপল হয়ে উঠেছে। আজ সুজনের উপর সে নির্ভরশীল, তার সেই স্থির প্রতিমূর্তি ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে সাধারণ রমণী। সুজনের ভাষ্যে মাসীমার সঙ্গে বার্তালাপে রমলারই প্রতি শোচনীয় আক্ষেপ ফুটে ওঠে –

"আমি তো দেখছি, আমাদের দেশের মেয়েরা কেবল গিন্নি হতে চায়, আর গিন্নি নিজে জড়িয়ে পড়ে, পরকেও জড়ায় সংসারে ... কি যে সুখ পায়!"[৩২]

রমলার ভেতরের জোয়ার খগেনবাবুর প্রতি এতই প্রবল, এতই ঘূর্ণিময় যে সে স্থির সংকল্পে সুজনকে বলে –

"দেখা হলে আমি তাকে নিজের করব মানব না।"[৩৩]

আবর্তের মধ্যে খগেনবাবু সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত সরাসরি বা চিঠিপত্রেও কারও সংস্পর্শে নেই। এটা যেন তার আত্মানুসন্ধানে নিজেকে পরীক্ষা করার তাড়নায় নিরুদ্দেশ বাস। কিন্তু সবার জীবনে বিশেষ করে রমলার মনে-জীবনে ঘূর্ণিময় আলোড়ন তুলে গেছেন। আর রমলার অন্তর্মনের জোয়ার উপচে পড়েছে, যার ঝাপটে সুজনের জীবন ও অন্তর্মনও আবর্তিত। 'আবর্ত' উপন্যাসে ধূর্জটিপ্রসাদ ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজির 'Libido' তত্ত্বটিকেও ছুঁয়ে গেছেন। যা পরিলক্ষিত হয়, নিভৃত রাতে কাশীতে অক্ষয় ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির চারদেয়ালের ভিতর বিপরীত লিঙ্গের দুই মানবাত্মা রমলা ও সুজনের সান্নিধ্যে। মানবাকাঙ্ক্ষা, বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ এবং সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) আদিম ও চরম সত্য। এটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়-পর্যালোচনায় আভাসিত এবং বৈজ্ঞানিক সমর্থিত সত্য। এটাকে ধূর্জটিপ্রসাদও অস্বীকার করেননি, বা রমলা, খগেন বা সুজন (খগেনবাবুর বিচারে যার মধ্যে শীতলতা রয়েছে বর্ষাস্নানের শীতলতা, বরফের কঠিন শৈত্য নয়) কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই নিভৃত রাতের অন্ধকারে সুজনের মাথায় ঘোরপাক খায় খগেনবাবুর চিঠিতে লিখিত একটি উপলব্ধি 'দিনের সাধনা রাতের বাসনা'। এর অর্থ উদ্ধারে তার মন ছটফট করতে থাকে, পরবর্তী লাইন সে স্মরণ করতে পারে না। সে অস্বাভাবিকতা অনুভব করে। কারণ দিনের রমলাদি, আজ রাতে চপল, উদ্বেলভাবে সত্য প্রকাশে উদগ্রীব। সুজনের ভয় হয়, ভদ্রতা রক্ষার দায় এসে পড়ে, স্রষ্টা ধূর্জটিপ্রসাদ খগেন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে বলেছিলেন–

"সত্য হ'ল সহজ ও স্বাভাবিক, ভদ্রতা হ'ল অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম।"[৩৪]

সুজন পরবর্তী লাইনগুলো স্মরণে আনতে পারে না। কিন্তু আনতেই তার হবে, রমলাদিকে জিজ্ঞাসা করে। খগেনবাবুর প্রতি আকৃষ্টতায় ধ্যানে নিমগ্ন, ভদ্রতার মুখোশ উপরে সত্য স্বীকারে অকুণ্ঠ রমলা সহজ ও স্বাভাবিক উচ্চারণে আওড়ায় –

> *"দিনের সাধনা, রাতের বাসনা, দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব, আলোর বুদ্ধি,*
> *তমিস্রার দেহ, এই কি চিরন্তন বিরোধ।"*[৩৫]

অস্থির রমলাদেবী এবং শীতলতায় পূর্ণ সুজনের অন্তর্মন স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের বিরোধে-দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত। অন্তর্মনে জোয়ার, বন্যা প্লাবিত হচ্ছে। 'রমলা দেবীর ঠোঁট সুজনের রগে ঠেকল।' (পৃঃ ২২৭) বিছানায় শুয়ে সুজনের অবচেতনে উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে জন্তু, জানোয়ার, আদিম-আধুনিক বিভিন্ন মুখচ্ছবি, বিভিন্ন বস্তুর প্রতিচ্ছবি। দৃশ্য-অদৃশ্যের খেলা চলছে, বানর, বাঘ, মাস্টাডন, ম্যামথ, কত কাল্পনিক জীব মনে ভাসতে থাকে সুজনের। অদ্ভুত অনুভূতি স্পর্শ করে সে। আগুনের স্পর্শ দেয়ালের চুনকাম খসে পড়া, চলৎশক্তিহীন জানোয়ারের লাফালাফি বুকের উপর। 'একটা মানুষের মত জানোয়ার এল' (পৃঃ ২২৭)। সুজন তড়িঘড়ি উঠে বসে। এই যে মানুষের ভদ্রতা এবং আদিম প্রবৃত্তির টানাপোড়েনে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুব সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছে। সুজনের অস্বাভাবিকতা অনুভব করে রমলা তাকে বলে, 'এসো স্বাভাবিক করে দিই, '– কষ্ট হচ্ছে সুজন?'

> *"সুজন চেয়ারের হাতলের ওপর প্রস্তরমূর্তির মতন বসে থাকে; জিভ আসে শুকিয়ে, চোখ জ্বলে। রমলা দেবীর একটি হাত তুলে সুজন আঙুলগুলি আপন চোখে বোলায়, তারপর ঠোঁটে, তারপর হঠাৎ হাতের তেলো, বুকে চেপে ধরে ... তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে যায়। আমি তোমাকে চাই না,- তুমি তাকে ভালবাস তাই তুমি আমার আপন ... বুকটা মুচড়ে যায় কেন? এই ত' স্বাভাবিক, এই ত' গ্রহণ করে এসেছ, এই গ্রহণ করতে হবে। মা-এর মুখ মনে পড়ে না কিছুতেই।"*[৩৬]

এখানে লেখক স্পষ্ট করেন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মানবিক আকাঙ্ক্ষার সহজাত সত্য রূপটি। তা পাঠের সময় পাঠককে হঠাৎ বিচলিতও করে না। কারণ লেখক রমলার মানসিক অস্থিরতায়, রমলার কাশীর ভাড়াটে বাড়ির বৌ-গিন্নির কু-মন্তব্যে, অপমানবোধে ঘর ছেড়ে আসা, এবং অপরিচিত স্থানে বা

মাসীমার কাছে হঠাৎ আশ্রয় খুঁজে না পাওয়া প্রভৃতি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একটি পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাই অক্ষয়ের বাড়িতে সুজনের কক্ষে রাত্রিবাস এবং নিভৃত অন্ধকারে অন্তর্মনের আবর্ত বাইরে উপচে পড়ে। কিন্তু রমলা দেবী সুজনকে তার স্পর্শমাত্র দেন ভালবাসার। তার সমস্ত হৃদয়-দেহ গচ্ছিত রেখেছিলেন খগেনবাবুর প্রতীক্ষায়। তিনি দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিলেন খগেনবাবুর বিরহে। আর রমলার সামান্য স্পর্শ সুজনের মনেও অল্পক্ষণের জন্য আলোড়ন তোলে। 'আমি তোমাকে চাই না, তুমি তাকে ভালবাস তাই তুমি আমার আপন'। এই প্রত্যাখ্যানে তার বুক মুচড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতেই 'ভোরের আগমনে রাতের বাস্তব অন্তর্নিমিলিত হয় এবং 'ভোর ভৈঁ'- সানাই বেজে উঠে।' (পৃঃ ২২৮)

জীবন আবর্তে শীতলতায় পূর্ণ, সৌজন্যতায় নির্লিপ্ত, মৈত্রী সাধনে (সমন্বয় সাধন) সংকল্পবিদ্ধ সুজনও আজ অস্থির। তার অন্তর্মন বিদ্ধ, বিচলিত জোয়ার এত প্রবল বেগে এসেছে যে, সে এই সংকটে বিজনের উপস্থিতি কামনা করে। অন্তঃশীলার শেষেই জীবন আবর্তে সবার মুখোশ খসে পড়েছে।

> *"খগেনবাবুর মুখোশ বুদ্ধিবাদ; হাঁপিয়ে উঠলেন তাই অন্তঃসারশূন্যতার জন্য একটানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। মুখোশ গেল টুটে, তারপর দে ছুট। ... রমলা দেবীর মুখোশ ছিল আধুনিক সমাজের ভদ্রতা, খসে গেল খগেনবাবুর এক হ্যাঁচকা টানে। প্রকাশিত হল দুর্নিবার প্রবৃত্তির আবরণহীন মূর্তি।"*[৩৭]

ভাবতে ভাবতেই সুজনের সংবিৎ ফিরে আসে। তার মন অস্থির হয়। রাত্রির অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তাকে ভয়ভীত ও রোমাঞ্চিত করে। গালে স্পর্শ অনুভব হয়।

> *" 'এস স্বাভাবিক করে দিই।' সুজনের বুকটা মুচড়ে যায়। ... বিজন আসুক এসে রক্ষা করুক সকলকে। তার করলে, 'চলে এস, প্রয়োজন আছে তোমার উপস্থিতির।"*[৩৮]

আবর্তে বিজনেরও বিবর্তন হয়েছে। টেনিস খেলোয়াড় বিজন রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে। চিঠি মারফত জানায় সুজনকে, সে সোসিয়ালিজমে দীক্ষা নিয়েছে। তার জীবন এখন আর খেলাধূলা ও পড়াশোনার গণ্ডিতে নয়। দেশের প্রয়োজনে সে বিপ্লবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। এভাবে 'আবর্ত' উপন্যাসে প্রত্যেকটি চরিত্রের জীবন বিভিন্ন আবর্তের সম্মুখীন। তাদের বিবর্তিত রূপ পরিলক্ষিত হয়, কখনও অন্তর্লোকে, কখনও বহির্জীবনে। আর একাকী হরিদ্বারে খগেনবাবুর মনোলোকের গহনে চলেছে রমলা ও সাবিত্রীর

বিশ্লেষণ, আশ্রমে সামাজিক অনিয়মের বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে আপত্তি ঘৃণা। অতীত ও বর্তমানের নিরীক্ষণ। এবং রমলার প্রতিক্রিয়ার প্রতি উন্মুখ ব্যাকুলতা। এখানেই 'আবর্ত' উপন্যাসটি এক অন্য মাত্রা লাভ করে। প্রধান চরিত্রের মানসিক পরিক্রমা তখনও প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃশীল গতিতেই চলেছে। কারণ খগেনবাবুকে ঘিরেই রমলা, সুজনদের জীবনে আবর্ত তৈরি হয়েছে। কিন্তু খগেনবাবুর স্বেচ্ছা-নির্বাসনে আপনজন-বিচ্ছিন্ন, সমাজবিচ্ছিন্ন আশ্রমবাসের অভিজ্ঞতার মধ্যেই চলেছে অন্তর্গহনে মানসিক পরিক্রমা। আবর্তে খগেনবাবুর মানসিক যাত্রা অব্যাহতই রয়েছে। তাই আবর্ত কাশী ও হরিদ্বারের কিছুটা সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশে, বিজনের মাধ্যমে তৎকালীন রাজনৈতিক আলোড়ন অর্থাৎ সোসিয়ালিজমের প্রভাব এবং মানবিক জীবনশৈলীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণে এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। এখানে অন্তঃশীলার মতো চেতনাপ্রবাহের নির্দিষ্টতা ধারণ করে আবর্তের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিজনের আগমন এবং সুজন ও বিজনের সঙ্গে রমলার দিন অতিবাহিত হয়। অষ্টম অধ্যায়ে হরিদ্বার থেকে খগেনবাবু ফিরে আসেন কাশীতে। শুরু হয় আরেক নতুন অধ্যায় জীবনের। সুজন ভেবেছিল আশ্রমবাসী খগেনবাবুর পরিবর্তন হবে। কিন্তু খগেনবাবুর ধাত বুদ্ধিবাদীর, যুক্তিবাদীর। তিনি বদলাননি। অযত্নে তার শারীরিক অবনতি হয়েছে। কিন্তু মানসিকভাবে তিনি সেই চিন্তাশীল, যুক্তিবাদীই রয়ে যান। কারণ লেখক তার পরিবর্তন নয় ক্রমবিবর্তন দেখাতে চেয়েছিলেন। হরিদ্বারে রমলার প্রতি উন্মুখ খগেনবাবুর মনোগহনের অস্থিরতা পাঠক দেখতে পায়। কিন্তু দাম্ভিকতায় এখনও তার জোর। তাই রমলার আহ্বানে তিনি নিজেকে আরেকবার পরীক্ষা করে নেওয়ার অনুমতি চান। সুজনের সঙ্গে চলে সোসিয়ালিজমের প্রয়োজনীয়তা, ভাল-মন্দ নিয়ে যুক্তিবাদী পর্যালোচনা। সবার প্রত্যাশা খগেনবাবুর প্রতি, আশ্রমবাবার পর এবার নিশ্চয়ই তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু খগেনবাবু জীবনসন্ধানে নতুন সমাজে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। নিজের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। এটাই তার ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন নয়। কাশীতে রমলার উপস্থিতি শুনে তিনি কৌতূহলী বা আগ্রহী নন। সুজনের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, এটা সংযম না রমলাকে ভোলার প্রচেষ্টা। এই সব বিভ্রান্তির মধ্য দিয়েই খগেনবাবু চরিত্রের ক্রম-উন্মোচন ঘটতে থাকে অন্যান্য চরিত্র ও পাঠকের কাছে। সুজন সোসিয়ালিজম সম্পর্কে জড়বাদের যে-ব্যাখ্যা ধারণা প্রত্যাশা করেছিল খগেনবাবুর কাছে, খগেনবাবুর বিবেচনায়-চিন্তায়-ধ্যান- ধারণায় সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত ব্যক্ত হয়। এখানেই মুক্তচিন্তায়, বুদ্ধিবাদে এবং সময়োপযোগী রাজনৈতিক পথ

ও মত সম্পর্কে ইতিহাসের মানবযাত্রায় সম্মিলিত পথের নির্দেশক রূপে সোসিয়ালিজম তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়। তার চিন্তাস্রোতে সমকালীন পৃথিবী, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ার সন্ধিক্ষণে সোসিয়ালিজমই সমস্ত বন্ধুর পথ বলে বিবেচ্য হয়। যদিও তার মধ্যে কিছু নেতি বা ফাঁকও দৃষ্টিগোচর হয়। তাই খগেনবাবু বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায়, মুক্ত-বিবেচনায়, সমাজের একজন হয়েও নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই তিনি সমন্বয় চান। আর এখানেই লেখক তার চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তোলেন। তাঁর ব্যাখ্যা –

> *"সোসিয়ালিজম মানে কেবল জড়বাদ নয়, শুধু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও নয়, মাত্র শ্রেণিবিরোধ নয়, মজুরের প্রাধান্য নয় – সব মিলে একটা। সোসিয়ালিজম চলার ধর্ম; জীবনের জন্য, এ যুগের ধর্ম এই অর্থে যে সেটি বর্তমানে অন্তর্নিহিত, এবং সেই সঙ্গে আগতপ্রায় নতুন সমাজ রচনার ধৃতি তত্ত্ব। ... একের মধ্যে সব শক্তি পুঁজি করা নেই সুজন, আবার বাইরের বহুর মধ্যেও নেই, তারা ত জড় – এই দুই-এর মিলনে আছে। অন্যকে না পেলে আমি পূর্ণ হব কেমন করে! ফ্রয়েড ও মার্কসের সমন্বয় চাই।"*[৩৯]

এখানে রাজনৈতিক দল পর্যালোচনা বা সোসিয়ালিজম সম্পর্কে খগেনবাবুর মতামত মুখ্য নয়। বা সামাজিক সংস্কার বা বাধা-বিপত্তি এবং রমলা ও খগেনবাবুর সম্বন্ধ স্থাপনে সেভাবে প্রতিরোধ প্রবল নয়। লেখকের মূল শৈল্পিক অভিপ্রায়টি হল ব্যক্তি (লেখকের ধারণায় পুরুষ/person) থেকে সমবায়ী ও সংযোগী সত্তারূপে উত্তরণের প্রতিক্রিয়া, অভিযাত্রা ও মানসিক টানাপোড়েন। মানুষের মনের উপর সমকালীন সমাজ, সংস্কারের প্রভাব পড়বেই, সে যতই বুদ্ধিবাদী হোক না কেন। সত্তা সমাজকে, দেশকে বাদ দিয়ে নয়। তাই খগেনবাবুর জীবনে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে মূল প্রতিপাদ্য intellect type (বুদ্ধিবাদী প্রতিনিধি) আত্মমুখী খগেনবাবুর ব্যক্তিচরিত্রের আত্মানুসন্ধান, ক্রমবিবর্তন এবং ব্যক্তিচরিত্রের মুক্তির পথ খোঁজা। তার নিষ্কর্ম চিন্তাশ্রয়ী, বই ও জ্ঞাননির্ভর জীবন যাপন তাকে বুদ্ধিবাদের শিখরে পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি হয়ে পড়েছিলেন আত্মমুখী। তার বুদ্ধিসর্বস্বতা এবং একাকীত্ব যে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিয়েছিল, তার থেকে মুক্তি সম্ভব একমাত্র অপর সত্তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে, সমাজের সঙ্গে যোগ সাধনের পথে। তাই 'ব্যক্তি' থেকে 'পুরুষে' যাত্রা 'individualism' থেকে 'personalism' এর পথে। এটাই মুখ্য অবলম্বন উপন্যাসের। তাই সেই যুগের উপযোগী চরিত্র সৃষ্টির

মাধ্যমেই তা অভিব্যক্ত করেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত 'বক্তব্য'-এর উদ্ধৃতিতে তিনি যা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তাই স্পষ্ট রূপ লাভ করতে থাকে তাঁর সাহিত্যিক অভিপ্রায়ে। যে সামাজিক সত্তা, ও তার সমস্যাবলীর স্বীকার, নিরাকরণ নিয়েই সাহিত্য। সাহিত্যে নিজেকে বাদী-প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই হয়; আর সেই প্রকৃত সাহিত্যিক, বিশ্বনেতা যে চরিত্রের অভিব্যক্তির মাধ্যমেই, চরিত্রের জীবন পরীক্ষার মাধ্যমেই সমাজ, দেশ ও ইতিহাসের গূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে সক্ষম। আর তাঁর সাহিত্যেই এই প্রতীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। কারণ তথাকথিত intellectual type খগেনবাবুর চেতন-অবচেতনের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও চিন্তাপ্রবাহে উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। আর তাকে ঘিরেই অন্যান্য চরিত্রেরও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। একাকীত্ব, নিরালম্ব জীবন আত্মকেন্দ্রিক ও সীমাবদ্ধ তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাকে সম্পূর্ণতার জন্য অন্বিত হতে হবেই। আর এর জন্যই খগেনবাবুর আত্মানুসন্ধান ও জীবন পরীক্ষা করে নেওয়ার পালা। এখানেই ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস সম্পর্কে মননঋদ্ধ সমালোচকের পর্যালোচনা যথার্থতা হারায়। যারা উপন্যাস ত্রয়ীকে সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর সূক্ষ্ম, জটিল হৃদয়াবেগের বিবরণকেই মূল বিষয় রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। এটা আংশিক সত্য কিন্তু মূল বিষয় রূপে সমীচীন নয় মনে হয়। কারণ মূল বিষয়টি প্রথম থেকেই প্রধান চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্ত হয় যে, এটা আসলে তথাকথিত নিষ্কর্ম বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে পুরুষার্থে উত্তরণের অভিযাত্রা। যার জীবন-মানস পরীক্ষিত হতে হতে চলে অপর চরিত্রগুলির সংস্পর্শে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনের প্রতি বৌদ্ধিক দায়িত্বের বোধে। তাই অন্তঃশীল প্রবাহ অতিক্রম করে ব্যক্তিগত জীবনের আবর্ত স্থিত হয় রাষ্ট্রিক সমস্যায় বৌদ্ধিক বোধে। এক থেকে দুই অর্থাৎ রমলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোহানাভিমুখে সামগ্রিক সমবায়ী জীবনে অন্বয়, শ্রেণিচেতনায় উত্তরণের পালা শুরু হয়। রমলা দেবীর সঙ্গে যতক্ষণ মাসীমার বিরোধের অবসান হয়নি, খগেনবাবুর মনে হয়েছে –

> *"দুজনের মিলন অসম্ভব। ব্যর্থতায় চোখে জল আসে। দুরপনেয় পার্থক্য।*
> *যাকে জানতেন, যাকে আপন ভেবেছেন তার সঙ্গে মিলন হয় না যখন, তখন*
> *কী উপায়ে সাধারণ জীবনের ভাগী হবেন?*
>
> *... সাবিত্রী, রমলা, মাসীমা পর পর এল, গেল ... কে রইল*
> *সামনে। বড় একলা অথচ মিলতে হবে ঙ্ম ... এ কী হতাশা উপদেশ দেয় ...*

ভাসিয়ে দাও নিজেকে।"[৪০]

রমলা-খগেনবাবুর সম্পর্কে মোড় আসে। এতদিন আত্মিক মিলন ছিল। কিন্তু কাশীর সমাজ ও মাসীমার আপত্তিতে চলছিল মানসিক টানাপোড়েন, মিলনে অনিশ্চয়তা। আবর্তের শেষে মাসীমার মৃত্যু তা ঘুচিয়ে দেয়। রমলা ও খগেনবাবুর 'একত্র বাস' এবং সম্ভাব্য দৈহিক মিলনে আর কোনও বাধা থাকে না। খগেনবাবুরও একটি বিরোধের অবসান হল। খগেনবাবুই বলেন —

> *"আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় আত্মম্ভরি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সঙ্কল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই তার একমাত্র প্রতিকার। . . . এ কি হ'ল! এতদিন সংস্কারের মূলধন ভাঙিয়ে চলল, আজ একটি কানাকড়িও নিজের হাতে নেই, যা বাকি ছিল সব গচ্ছিত রাখলেন, বাঁধা পড়ল রমলার হাতে। এখন সব তারই। তারই শক্তিতে চালিত হবেন ভাবতে আত্মসম্মানে লাগে। অতএব তার শক্তিকেও ঘোরাতে হবে, চালাতে হবে সকলের মধ্যে।"*[৪১]

এই 'সকলের মধ্যে' উচ্চারণই যেন মোহানার প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত। একক সত্তা খগেনবাবু 'মৈত্রী স্থাপনে' অপর সত্তা রমলা দেবীর সঙ্গে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হয়েছেন ঠিক। এখন মোহানায় শ্রেণিস্বার্থে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকারীদের সহায়তার মধ্য দিয়ে তার অভিপ্রেত যাত্রা। ব্যক্তি থেকে পুরুষের (person) দিকে অর্থাৎ জনসাধারণের দিকে। ধূর্জটিপ্রসাদের অভিপ্রেত পুরুষার্থের দিকে অর্থাৎ সমগ্রের সঙ্গে অন্বিত হওয়ার অভিমুখে। তাই কাশী ছেড়ে কানপুর অভিমুখে গন্তব্য নির্ধারিত হয়। তখন কানপুরে মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক-মজুর-সাধারণ শ্রেণির ধর্মঘট চলছে, রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকট আরো জোরালো রূপ ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতি স্রষ্টা ধূর্জটিপ্রসাদের ১৯৩৭-৩৮ সালে লখনউ-এ যুক্তপ্রদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করার সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতা থেকে কাশী, কাশী থেকে হরিদ্বার এবং আবার কাশী ফিরে আসার পরও খগেনবাবুর আত্মানুসন্ধান শেষ হয়নি। কারণ একাকী ব্যক্তি খগেনবাবুর ব্যক্তিসত্তা রমলা, সুজন, বিজনের সংস্পর্শে এবং রমলার মধ্যে আত্মনিবেদন ও সমর্পণে সার্থকতা লাভ করেছে। স্রষ্টা ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তা-চেতনা ও মননের একটি সূক্ষ্ম দিক হল মানবিক সমস্যাগুলোকে সমাজ ভাবনার সম্পর্ক-যুক্ত করে দেখা। তাঁর সমাজবীক্ষার মূলে

ছিল বিভিন্ন সামাজিক চিন্তার সমন্বয়ে ব্যক্তিসত্তার উত্তরণ। তাঁর সমাজতত্ত্বমূলক ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল ভারতীয় সমাজ-দর্শন। তিনি তথাকথিত পশ্চিমি (western) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা আত্মকেন্দ্রিক (individual) অর্থে নয় বরং ভারতীয় তত্ত্বে ব্যক্তি/ব্যক্তিত্ব (personality) বা পুরুষ (person) কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির স্বরূপ হবে, স্ব-অধীন কিন্তু সংযোগী, সমবায়ী, সামাজিক সম্পর্কে কর্মশীল। ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমেও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সম্মিলিত শক্তির প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। আর এই সম্মিলন, পথের সকল সহযাত্রীর পথ দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তৎকালীন সমাজতন্ত্রে অবলোকন করেছিলেন বলেই রাজনৈতিকভাবে মার্কসিজমে বিশ্বাসী। নিজেকে তাই মার্কসোলজিস্ট বলতেন। আর তাঁর 'personality' তত্ত্বের নিরিখে সমাজতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব রূপটির নিদর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে খগেনবাবুর চরিত্রের জীবন-ক্রিয়ায় এবং উত্তরণে। ব্যক্তির বিশেষত্ব বিকশিত ও প্রসারিত হয় সমাজধর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই। ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাহারা' গ্রন্থের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় ব্যক্তি, সমাজ ও সোসিয়ালিজমের সমন্বয়ী শক্তির গুরুত্ব, আর অন্যদিকে একাকীত্বের, অসহযোগিতার দোষ —

> *"মানুষ কিছু একলা ফুটে ওঠে না, সমাজের মধ্যে বাস করতেই হবে তাকে, তারই মধ্য দিয়ে তাকে ফুটে উঠতে হবে। সমাজের মধ্য দিয়ে ফোটাই আদৎ কথা। অ-সামাজিক ব্যক্তি পশুর সমান। ... ব্যক্তিও চাই সমষ্টিও চাই। দু'এর কোনটিকে বাদ দিলে চলবে না। সেই জন্য খাঁটি ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা খাঁটি সমষ্টিতন্ত্রের দোষ একই।"*[৪২]

যে-স্রষ্টার বিশ্বাস ছিল চরিত্রের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা ও ইতিহাসের গূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করাই সার্থক জীবনশিল্পীর দক্ষতা। তাঁর সৃষ্টিতেই ফুটে উঠল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী চরিত্রের ক্রমিক অভিযাত্রায় ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তরণ। বৃহৎ সাধারণ জীবনের সংগ্রামে সমন্বিত হওয়ার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল আবর্তের মধ্যেই। যার সূচনা হল কানপুরে 'মোহানা' উপন্যাসে। রমলা দেবীর অকুণ্ঠ আত্মদানে এবং দুজনের সম্ভোগ ও মিলনে খগেনবাবু যৌবন ফিরে পান। তাদের একত্রবাসে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়ও কোনও বাধা নেই। কিন্তু রমলার সান্নিধ্যে এবং খগেনবাবুর সমস্যাবহির্ভূত তৃপ্ত জীবনেও রয়ে গেল এক অস্থিরতা। মোহানার সূচনাতেই রমলার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এবং শারীরিক সম্ভোগেও অতৃপ্তি ও বিচ্ছেদের

সম্ভাব্য ইঙ্গিত লক্ষিত হয়।

> *"এক ক্লান্ত প্রত্যুষে শয্যায় বাসি বেলফুলের দুর্গন্ধ নাকে আসতে খগেনবাবু উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় রমলা দেবী তাঁকে শুইয়ে দিল।..."*[৪৩]

খগেনবাবুর অতৃপ্ত মনের চেতনায় ভাসতে থাকে সাবিত্রীর মৃত্যু, মাসীমার মৃত্যু, দেশভ্রমণ, বুদ্ধির চর্চা – মুক্তির এক একটি স্তর ছিল। পেঁয়াজের খোসা খুলতে খুলতে প্রত্যাশিত কোনও সারবস্তুর সন্ধান পেলেন না। এসবই যেন সাপ-মই -এর খেলা। সব বিফল। তাই কানপুর আসার পর ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিজনের সংস্পর্শে অতৃপ্ত খগেনবাবু শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। আর রমলা এবং খগেনবাবুর দূরত্ব বাড়তে থাকে। যা রমলা দেবীও বুঝে নেন। আর এখান থেকেই শুরু হয় খগেনবাবুর বিজন, সফীক, মেহবুব, করীমদের সঙ্গে বৌদ্ধিক সাহায্যের বোধে বৃহৎ কর্মজীবনে নিজের এবং সাধারণের সঙ্গে ব্যক্তির অন্বয়ে 'সামগ্রিক জীবনবোধে' উত্তরণ। তিনি পার্টির নোট লিখে দিয়ে সাহায্য করেন। আর রমলা দেবীর লঘু চিত্তবিনোদনে বিজন ও প্রোফেসরের সংস্পর্শে ক্লাব, পার্টিতে সময় অতিবাহিত করে শোচনীয় পরিণতি লক্ষিত হয়। যদিও তার মধ্যে স্বতন্ত্র কর্মজীবন নির্বাচনের কথা ভাবেন নিজের জন্য মাস্টারি জুটিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশে খগেনবাবুর কাছে।

আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিচর্চার জগৎ থেকে খগেনবাবু কানপুরে শ্রমিক সংঘের সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের পুথিবিদ্যা বা অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে বুঝলেন, অভিজ্ঞতা ও পুথিবিদ্যার এবং কর্মজগৎ এর পার্থক্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি কার্যকর নয় সম্পূর্ণরূপে। তাকে নিজের দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলা দরকার। বিভ্রান্তি জাগে তার মনে লেনিনের কর্মপদ্ধতি কী সবাই বুঝেছিল। তবুও সময়ের তাগিদে, নতুন পৃথিবীর বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আহ্বানকে শিক্ষিত বুদ্ধিবাদী এবং স্বঘোষিত Marxologist স্রষ্টা ধূর্জটিপ্রসাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন, সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রকাশ পায় মোহানায়। এবং তথাকথিত বুদ্ধিবাদীদের উচিত আত্মকেন্দ্রিক জীবন ও স্বশ্রেণির অভিজাত জীবনপ্রণালী থেকে বেরিয়ে রাষ্ট্রিক ও সময়োপযোগী তাগিদে শ্রমিক-শ্রেণির পাশে দাঁড়ানো। কারণ রাজনৈতিক সমস্যার বলয় অতিক্রম করে তা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল। তাই অশিক্ষিত কর্মী শ্রমিক-মজদুরের পাশে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশে ও সাহায্যে বুদ্ধিবাদী শ্রেণির প্রয়োজন। এই পথে ব্যক্তি ও সমষ্টির সংযোগই প্রধান। এই তত্ত্বকথাই যেন ঘোষিত হল মোহানায়।

খগেনবাবু অনুভব করলেন—

"সফীকের ধর্মটাই যেন মানুষ সর্বস্ব, মার্কসিজম তা ছাড়া কিছু হতেই পারে না, তার আদ্যন্ত মানুষ, মানুষের চেষ্টাই তার শক্তি, প্রেরণা, সব সব কিছু।"[৪৪]

তাই এতদিন যে খগেনবাবু বৌদ্ধিকভাবে পার্টির লেখা-পড়ায় সাহায্য করতেন, আজ তিনি সফীককে জেল থেকে মুক্তির প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনে সাধারণের, শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে নিজেকে নিবেদন করলেন। বিজনের অপরিণত জ্ঞান এবং ধনীর ছেলের শৌখিন সোসিয়ালিজমের ফ্যাশনের ফল। বিজন সফীককে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। প্রকৃত সংগ্রামী নেতা, শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধি এবং মার্কসিজমের ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ সফীককে মুক্তির প্রচেষ্টায় মহবুব আর কিষণ এর সঙ্গে রাত দশটায় ট্যাক্সিতে করে লখনৌ এর উদ্দেশ্যে খগেনবাবুর যাত্রা। এখানেই 'মোহানা' সমাপ্ত। পিছনে পড়ে রইল খগেনবাবুর অতীত, রমলা, বুদ্ধিসর্বস্বতা। আর নতুন কর্মজীবনের অভিমুখে, সাধারণ মানুষের মুক্তির পথে বুদ্ধিবাদী খগেনবাবুরও মুক্তির পথ, ব্যক্তিচরিত্রের মুক্তি সমগ্রের পথে প্রশস্ত হয়ে চলল।

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা - ত্রয়ীতে একজন বুদ্ধিবাদী চরিত্রের মানসিক অভিব্যক্তিই ঘটেছে। কিন্তু অন্তঃশীলায় চেতনাপ্রবাহী যে শৈল্পিক অভিপ্রায়ে উপন্যাসের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, আবর্তে তা থেকে সরে এসেছে। এবং আবর্ত ও মোহানা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক এবং সামান্যভাবে চেতনাপ্রবাহের গতির আভাস লক্ষিত হয়। কিন্তু লেখকের রীতির পরিবর্তন মনে হয় কিছুটা তৎকালীন realism এর দাবি মেনে, কিছুটা পরিচয়ের গোষ্ঠীর উপদেশে যেমন হয়েছিল গোপাল হালদারের রচনারীতির ক্ষেত্রে। আর বিশেষত তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রধান সমস্যার আবর্তের শেষদিক থেকে মোহানার বিষয়বস্তুতে স্থান পাওয়ায়।

অন্তঃশীলার সূচনা স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহননে। যার ফলে রমলা-সুজন-বিজনের সংস্পর্শে আসা খগেনবাবুর। পরে একাকী ব্যগ্র জীবনে আত্মানুসন্ধানে বুদ্ধিবাদীর দেশভ্রমণ। রমলা ও নায়কের টানাপোড়েন, পরে মিলন। এরপর আবার বিচ্ছেদের ইঙ্গিতে তাদের সম্পর্কের শিথিলতা মোহানায়। এবং ব্যক্তিজীবন থেকে সাধারণ সমষ্টি বা সামগ্রিকতায় সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিচেতনায় খগেনবাবুর ব্যক্তি-চরিত্রের মুক্তিপথে যাত্রা। আপাতভাবে এই হ'ল ত্রয়ীর সারসংক্ষেপ। এতে সুনির্দিষ্ট কোনও ঘটনা, কার্যকারণ সম্পর্ক বা প্লট নেই। যদিও আবর্ত মোহানায় কিছু কিছু প্লটের সম্ভাবনা উঁকি দেয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচারে উপন্যাস

ত্রয়ীর কোনও সিদ্ধান্ত বা সুনির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিও লেখক দেন না। মোহানার সমাপ্তি যেন খগেনবাবুর জীবনে নতুনত্ব সন্ধানের আরেক পালা। তাই লেখকের কথায়ই তার আলোচনায় একটি আপাত সমাপ্তি লক্ষ করা যায় —

> *"প্রুফ সংশোধনের জন্য সব খণ্ডই পড়তে হয়েছে। যাকে চিত্ত বিনোদন বলা যায়, তার মালমশলা খুব কমই পেলাম। যার সন্ধান মিলল, সেটা একটানা গোটা কয়েক চরিত্রের অভিব্যক্তি। তার মধ্যে কোথায় যেন পুরুষকার রয়েছে। স্রোতে ভাসে খড়কুটো। খড়কুটোর সাহিত্য হবে না কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব এবং কলাবিদের হাতে সেটা রসোত্তীর্ণও হবে। কিন্তু রসের নামে জীবনের অন্তঃশীল দ্বন্দ্ব ও তার আবর্তকে, মোহানা দিয়ে তার আকুল যাতায়াতকে সঙ্কীর্ণ করা আমার মনোমত নয়, এ যুগের উপযোগী নয়।"*[৪৫]

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা - ত্রয়ী সংলাপনির্ভর উপন্যাসও বটে। উপন্যাস ত্রয়ীতে অজস্র সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। যা নাটকীয় রীতির লক্ষণ। সংলাপ-রীতির মাধ্যমে চরিত্রগুলির চারিত্রিক ও মানসিক ধ্যান-ধারণার রূপকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। সংলাপই হয়ে উঠেছে চরিত্রগুলির চিন্তা-চেতনার দর্পণ। রমলা দেবী ও নায়ক খগেনবাবুর কথালাপে অনুমেয় যে এর মাধ্যমে একে অপরকে বোঝার অবকাশ পাচ্ছেন। খগেনবাবুর রূঢ় চরিত্র সম্পর্কে রমলার বা রমলার আধুনিক জীবনপ্রণালী সম্পর্কে কিছু বিরূপ ভাবনা পরস্পরের কথালাপে পরিবর্তিত হয়েছে। একে অপরকে বুঝতে চাইছে। যার ফলে নিঃসঙ্গ খগেনবাবু ও নিঃসঙ্গ রমলা দেবীর মানবিক সম্পর্ক তৈরির পথ প্রশস্ত হয়েছে উপন্যাসে। তা না হলে চরিত্রগুলোর আবর্ত মথিত জীবনে সূক্ষ্ম-জটিল-মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোর উন্মোচন সঠিকভাবে হত না। রমলা দেবীর সঙ্গে কথায় বা সংলাপে মানসিক সম্বন্ধের দিকগুলো স্পষ্টতর হতে থাকে। সামনাসামনি দুজনে বসে বার্তালাপের তাৎপর্য বা স্বরূপটি খগেনবাবুর যুক্তিতেই বিধৃত হয় —

> *"আপনি আমার কথা শুনছেন, আমি কথা কইছি — এই মানবিক সম্বন্ধটি ... এইটাই কিন্তু আসল, এই সম্পর্কেই আপনি আপনি, আমি আমি। কোন সাহিত্যিক এই চলিষ্ণু, গতিশীল এই অশরীরী অথচ বাস্তব সম্বন্ধরূপী সত্তাকে রূপ দিতে পারেন কখনও?"*[৪৬]

সংলাপের মাধ্যমে প্রশ্নে-উত্তরে, প্রত্যুত্তরে কোনও বিষয়ে মতপার্থক্যে, তর্কে, যুক্তিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। ভাবে-ভঙ্গিতে, কথা-বলার ধরনে মানুষের স্বাতন্ত্র্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরজনের নজরে গড়ে ওঠে। উপন্যাস ত্রয়ীতে সুজনের সঙ্গে, বিজনের সঙ্গে, পরবর্তীতে অধ্যাপক, ইংরেজ ছেলে রনি প্রমুখের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে- বিতর্কে বহির্জগৎ সচেতন জ্ঞানসচেতন খগেনবাবুর স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়। এবং অন্যান্য চরিত্রেরও চারিত্রিক দিকগুলি জীবন্ত, চলন্ত রূপে প্রকাশ পায়। এবং ব্যক্তিবিশেষে দু'য়ের পার্থক্য ও স্বভাব-বৈচিত্র ধরা পড়ে। উপন্যাসে কিছু জায়গায় নাম নির্দিষ্ট করে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনও সংলাপে কোনো নাম নির্দিষ্ট করে সাজানো হয়নি পরপর। নামহীন সংলাপগুলো বিশেষত বিভিন্ন জ্ঞাননির্ভর বিষয়ের উপর। যেন তর্ক-বিতর্ক-যুক্তির মাধ্যমে তার বিভিন্ন দিক দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত মনে হয়। বিশেষ করে সংলাপগুলো কে কোনটি বলেছেন তার চেয়ে সচেতনভাবে পাঠককে বুঝতে হয় কী বলা হয়েছে। অনেকটা ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাঁহারা'-এর রীতির মতো। সংলাপকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চতুরঙ্গে'। আর ধূর্জটিপ্রসাদের শুরুটা যেহেতু চেতনাপ্রবাহের রীতির উপস্থাপনা, তাই অন্যান্য চরিত্রগুলোকে সক্রিয় ও জীবন্ত করে, নিজের মতো তাদের রূপ দেওয়ার চেষ্টায়, সংলাপনির্ভরতার রীতির নতুনত্বে এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে বলা যায়। মনে পড়ে যায় ভারতীয় দর্শনে অনুসৃত পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ গ্রন্থনার রীতি।

ত্রয়ী ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ঔপন্যাসিকের মৌলিক চিন্তাধারা, বুদ্ধিদীপ্ত বিচার-বিশ্লেষণে রচনার শৈলী মাঝে মাঝে প্রবন্ধধর্মী হয়ে উঠেছে। চরিত্র নায়ক খগেনবাবুকে জ্ঞানের বিচিত্র ভাণ্ডারে বিচরণকারীরূপেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস ছুঁয়ে বিজ্ঞান পর্যন্ত তার বহুমুখী পাণ্ডিত্যময় প্রতিভার বিকিরণ বিচ্ছুরিত করা হয়েছে। স্রষ্টা এবং সৃষ্ট চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার যুগলবন্দিতে উপন্যাসে তথ্যসংশ্লিষ্ট, যুক্তিনিষ্ঠ, সমাজ-সচেতন, বিজ্ঞান-মনস্কতায় বহুমুখী বিষয়ের দিকদর্শনে পূর্ণতা লাভ করেছে। ভাবের পরিবর্তে তথ্যসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত উত্থাপন এবং সাহিত্যরসের সমন্বয়ে জগতের বিচিত্র রূপচিত্রের অন্বেষণের প্রবণতা লক্ষ করা যায় উপন্যাস ত্রয়ীতে। আর এগুলি প্রকাশ পেয়েছে নায়কের বই নির্বাচনে, পত্রিকা নির্বাচনে। প্রিয় বইগুলির উল্লেখে একটি একটি বিষয় বা প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মননঋদ্ধ সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং পর্যালোচনায় স্পষ্ট নায়কের বিস্তৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় তার বৌদ্ধিক সত্তা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ এবং জীবনকে বিবেচনা

করার দৃষ্টিভঙ্গির মূলেও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ গড়ে উঠেছে বই পাঠের ফলে। খগেনবাবুর আকর্ষণ বা আগ্রহ বিদেশি সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রতি। কারণ ভারতীয় কাগজে তিনি মৌলিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ দেখতে পান না। তাই এগুলো তার কাছে খবর বর্জিত। বিদেশি 'ক্রাইটেরিয়ান' 'অ্যাডেলফি', 'নেশন অ্যাথিনিজম' পড়তে ভাল লাগে আর এই পত্রিকা পড়ার প্রসঙ্গ ধরেই 'এলিয়ট', 'মিডলটনমারি', শেক্সপীয়ার, কীটস্, দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে তার চিন্তাধারা ব্যক্ত হয়। খগেনবাবুর পুস্তক প্রীতি এবং বিস্তৃত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিচয়ে লেখকেরই পুস্তক প্রীতি এবং জ্ঞানমূলক বই নির্বাচন এবং বই সম্পর্কে মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণ বা ধারণা ব্যক্ত হয়। স্কট, পাউইস, বেটিচেল্লির জীবনী, গ্যাসেট, মনক্রিফ, অরেলিয়াস, প্যাসকল, এপিকটেটাস, গ্যেটে, সেনেকা মনটেন, ফিল্মসংক্রান্ত বই, ব্লেক, বস ওয়েলের লেখা জনসনের জীবনী, প্রুস্ত জয়েস প্রমুখের অজস্র বই এবং তাদের জীবন সংক্রান্ত তথ্য তার নখদর্পণেই মনে হয়। তাই যেকোনও গম্ভীর কথালাপের প্রসঙ্গে এদের বই সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপমা বেরিয়ে আসে। এবং রবীন্দ্রনাথের বই সম্পর্কে খগেনবাবুকে অত্যন্ত মনোযোগী মনে হয়। কারণ 'দুই বোন' সম্পর্কে পত্রে রমলা দেবী মতামত জানাতে বলেছিলেন। তখন খগেনবাবু বলেন 'দুই বোন' একত্রে প্রকাশ হওয়ার পরই পড়বেন। কারণ রবিঠাকুরের বই একই মনোযোগে পড়তে তার ভাল লাগে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, একবার 'ঘরে বাইরে' পড়ার সময় মধ্যিখানে সাবিত্রী ঘরে ঢুকে নিজেকে মক্ষী বলে বিরক্ত করে। তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোগ্রাহিতার পরিচয়ই পাওয়া যায় তার কথায়। কাশী যাওয়ার পূর্বে 'সাংখ্যতত্ত্ব' ও উপনিষদ কয়েকটা কিনলেন। সুজনের নিজস্ব-সংগ্রহের লাইব্রেরিতে, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিরূপণ সংক্রান্ত বই ও প্রবন্ধ দেখে মনে মনে সুজনের বহুমুখী রুচি দেখে প্রশংসা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ, আত্মাভিমানের চরিত্রবৈশিষ্ট্যটিও ফুটে ওঠে। কারণ সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা করেন —

> *"সব বইগুলিই আধুনিক ও নতুন লেখকদের – একটিও পুরাতন লেখকদের নয়। আজকালকার ছেলেরা বই সম্বন্ধে বই পড়ে, পরাশ্রিত বই, তাই পরগাছা মন তাদের।"*[৪৭]

গ্যাসেটের বই হাতে নিয়েই মনে হয়েছে, দর্শনের অধ্যাপক লিখেছেন সমাজতত্ত্বের বই। ভালই হবে – গ্যাসেটের বই থেকে দুটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করে তিনি তাকে সমর্থনও করেছেন। দার্শনিক গ্যাসেট

সাধারণ জীবন এবং অভিজাত জীবন সাধনা সম্পর্কে বলেছেন —

> "*Noble life uncommon life, or Effort and inertia – These are the select men, the nobles, the only ones who are active and not merely reactive, for whom life is a perpetual striving and incessant course of twining. Training askesis. These are the ascettes – এই ত ঠিক! সাধনা করতেই হবে, স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটতেই হবে, নচেৎ গা ভাসান ভিড়ে, ফ্যাশনে — তাতে আভিজাত্য নষ্ট।*"[৪৮]

অর্থাৎ গ্যাসেট অভিজাত জীবন সম্পর্কে বলেছেন যে অভিজাত ব্যক্তিরাই স্বতন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীল, কর্মশীল, ব্যবহারিক এবং চিরন্তন সংগ্রাম ও সাধনায় কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রতী সন্ন্যাসী। আর খগেন্দ্রবাবু গ্যাসেটের এই ব্যাখ্যায় 'personality' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করে 'individuality' লিখতে পারতেন বলেও মন্তব্য করেছেন। আবার সাহিত্য সম্পর্কে তিনি কীট্‌সের negative capability-র ব্যবহারকে সমর্থন করেন। এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধিদীপ্ত পর্যালোচনায়, মতামতে উপন্যাসে প্রবন্ধধর্ম ফুটে ওঠে।

উপন্যাসে আরও বিভিন্ন ছবি এবং ভাস্কর্যের উল্লেখ করে অনেক উপমা ব্যবহার করেছেন। তা পরিবেশ এবং অবস্থা ব্যতিরেকে মানানসই। যেমন রমলার সঙ্গে কথালাপে, হঠাৎ তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হতেই তাকে বিষাদের প্রতিমূর্তি রূপে কল্পনা করে 'Saint Gaudens'-এর ছবি স্মরণ করা। রমলাকে পত্রে 'শুদ্ধ হয়ে শান্তি পাবার' উপদেশ দিয়ে, 'ফুজিয়ামার নিরালম্ব ছবির উল্লেখ এবং রমলার আবরণহীন বুকে চেতনাবিহীন নির্লজ্জভাবে পড়ে থাকায় 'নন্দাদেবীর বদরীনাথের পাশে বুক খুলে চিরটা কাল দাঁড়িয়ে থাকা' প্রতিমূর্তির বর্ণনা। সুজনকে লেখা চিঠিতে মৈত্রী সাধনের প্রসঙ্গে, নন্দলালের 'নন্দীভৃঙ্গী' ছবির বর্ণনা। ছবি, ভাস্কর্যের বর্ণনা বা উল্লেখ তার সাধারণ কথাগুলোকে গভীরতায় বিশেষত্ব প্রদান করেছে। ঐতিহ্য-কাল- সভ্যতা-সংস্কৃতি-ইতিহাস কাশীর বর্তমান অন্তঃসারশূন্য অবস্থাকে কেন্দ্র করে খগেনবাবুর চিন্তায় এসেছে। তৎকালীন কাশীতে খগেনবাবু লক্ষ করেন এখানে ঘুণ ধরেছে, সময়ের ছাপ, সভ্যতায় পলি পড়েছে, তার উপরই চলছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও সন্ন্যাসীদের বিরক্তকর ভিড়। কালের প্রবাহে ঘুণ ধরে আড়ষ্ট হয়ে পড়া ধর্মীয় তীর্থস্থানের অস্বস্তিকর রূপ দেখে খগেনবাবু ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির পুণ্যস্থানের মহিমাকে তুলে ধরেন —

"ইচ্ছে করে এদেরকে বলি, 'ওরে তোরা জানিস, কী ক'রে বুদ্ধদেব এইখানে প্রাণহীন ও প্রাণনাশী যাগযজ্ঞের বিপক্ষে মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেছিলেন? .. এই কাশীতে এলেন শঙ্কর হিন্দু ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। আর্যভূমি আর দাক্ষিণাত্যের পার্থক্য ঘুচে গেল, ... তারপর কাশী মরেও মরেনি, মধ্যযুগের সব মহাত্মারই পদধূলি পড়েছে এই কাশীতে।"[৪৯]

তারপর আওরঙ্গজেবের কৃতিত্বের কথা। বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙে মসজিদ তৈরি। আওরঙ্গজেবকে সবাই দোষ দেয়। কিন্তু খগেনবাবুর ভাল লাগে আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাহসকে, মানুষটাকে, তার চিঠি লেখার স্টাইলকে। আর এসেছে মধুসূদন সরস্বতী পণ্ডিতের কথা দয়ানন্দ, ভাস্করানন্দ এবং ত্রৈলঙ্গ স্বামী যারা কাশীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। খগেনবাবুর চিন্তায়-ভাবনায়, অভিজ্ঞতা, সভ্যতা, ইতিহাসের তাৎপর্য উদগীরণে, পাঠকের সামনে তৎকালীন কাশী ও ঐতিহ্যের ধারায় ঐতিহাসিক কাশীর রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাস ত্রয়ীতে সমাজতত্ত্বের দিকটিও কিন্তু প্রক্ষিপ্ত নয়। কারণ অন্তঃশীলায় রয়েছে স্বরাজ পার্টি, দেশবন্ধু সপ্তাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আবর্তে কংগ্রেস দলের মতবিরোধে ঝগড়া ও ডিকটেটরশিপের কথা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের হরিজনদের শিবমন্ত্র দীক্ষার প্রতিক্রিয়া, কাশীর শস্ত্রবাদীদের কার্যকলাপ। 'মোহানা'তে খবরের কাগজে উল্লেখিত লখনৌ, কানপুরে শ্রমিক ধর্মঘটের সম্ভাবনা, সাংহাইর গোলাবর্ষণ, মুসোলিনীর বক্তৃতা, সুভাষচন্দ্র বসুর জ্বরের ও স্পেনে ১০৮টি গীর্জা ধ্বংসের খবর। এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ তৎকালীন সময়কে সমাজ-বাস্তবতাকে জীবন্ত করে তোলে। তাই উপন্যাসে সমাজতাত্ত্বিক ধূর্জটিপ্রসাদ সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন না। বরং বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞাননির্ভর ও তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনায় সভ্যতা, সংস্কৃতি-ইতিহাস ছুঁয়ে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির দর্পণে স্বচ্ছভাবে তার প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে।

উপন্যাস ত্রয়ী একজন একনিষ্ঠ বহুমুখী বিদ্যাগ্রহী পাঠকের, তীক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তাবিদের, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপকের রচিত। উপন্যাসের বিষয়বিন্যাস ও নব্যরীতির উন্মোচনে পাঠককে সচেতনভাবে প্রথম থেকেই 'সিরিয়াস মুড' নিয়ে পাঠ করতে হয়। উপন্যাসে বিষয়, ভাব, রীতি এতই সিরিয়াস যে পাঠককে চিন্তার আশ্রয়ে এগোতে হয়। তাই ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝে ব্যঙ্গরসাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করে পাঠকের একঘেয়েমি কাটানোর চেষ্টা করেছেন। আবার কোথাও কোথাও কাব্যিক একটি

মেজাজও লক্ষ করা যায়। মেয়েদের গান গাওয়া - শোনা নিয়ে একটি কথা খগেনবাবুর মনে পড়ে। একবার কথক রামায়ণ পাঠ করেন, শ্রোতারা রামায়ণে জানকীর দুঃখে কেঁদে আকুল-পাথার। একজন মুসলমান প্রজাও শুনছিল তাদের মধ্যে। তার কান্না দেখে জমিদার তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কি জানে এ বিষয়ে। কিছু না জেনে কেন কাঁদছে। মুসলমান শ্রোতা বলেছিলেন যে, সে জানকী বা রামায়ণে ওদের কাউকে জানে না। কিন্তু কথকঠাকুরের মাথা নাড়ানো দেখে তার পুরনো 'রামছাগলের' কথা মনে হচ্ছে। আর একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পণ্ডিত গান শুরু করেন। তার গানের ভঙ্গিতে সফীক খুব সিরিয়াসভাবে তাকে উৎসাহিত করে। পণ্ডিতজী বাঃ বাঃ বাঃ ইয়ে আপিকা কাম। গাইয়ে গাইয়ে। আর সঙ্গে পঞ্চাশ জোড়া হাতে তাল সফীকের তালের সঙ্গে দ্রুত সজোরে পড়তে থাকে। গান তার একদিকে, সবাই বলে কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ জয় রামজীকো জয়। পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে ওঠে পড়েন। এভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ একদিকে নির্বোধভাবে ভঙ্গি করে গান শোনা, গাওয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে গানের মহিমা বিনষ্ট করাকে তির্যকভাবে বিদ্রূপও করলেন এবং তরল পরিহাসে উপন্যাসে হাস্যরসের সৃষ্টি করলেন।

উপন্যাস ত্রয়ীতে কাব্যিক মেজাজে একদিকে দুঃখ ও একাকীত্বের যন্ত্রণা এবং উপন্যাসের পরিবেশসাপেক্ষ মুহূর্তটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন। যেমন কিছু উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয় —

> *"দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে, গোপন সঞ্চারে — আমার প্রিয়ার মতো তার নম্রগতি; দুঃখ নামে করুণার মতন, আমার প্রিয়ার মতো বিষাদমাখা স্মিতহাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন।"*[৫০]

আবার—

> *"ভোর ভৈঁ — সানাই বেজে উঠে, অতি কোমল রেখার, শুদ্ধ গান্ধারে স্থায়ী হয় না — কত পরে কোমল ধৈতব, কী মধুর।"*[৫১]

লেখকের মাঝে মাঝে কাব্যিক মেজাজ ভাষা এবং হাস্যরস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির সৃষ্টিতে পাঠকের একঘেয়েমি কেটে নতুন আস্বাদ পায়। অন্যদিকে একাকী, নিভৃত মানসিক অস্থিরতাকে প্রশমিত করে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করে যায়।

উপন্যাস ত্রয়ীর সামগ্রিক আলোচনায় লেখক কথিত 'চরিত্রগুলির অভিব্যক্তিই' প্রধানত ধরা পড়ে ঠিক। কিন্তু চরিত্রের ক্রমবিবর্তনে লেখক একটি অন্তর্বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রগুলোর পরিণতি যাই হোক কিন্তু প্রধান-অপ্রধান প্রত্যেকটি চরিত্রের একটি বিবর্তনরেখা অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসে। এই বিবর্তনের মধ্যে লক্ষণীয়, লেখক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, আধুনিক স্বাবলম্বী নারী, শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ঘরের অপরিণত জ্ঞানে শৌখিন রাজনীতিতে দেশের উদ্ধারে ব্রতী বিপ্লবী এবং শিক্ষিত পরাশ্রয়ীদের মুখোশ খুলে খোলস ভাঙতে চাইলেন। এক কথায় সমস্ত কৃত্রিমতাকে নস্যাৎ করতে চাইলেন। খগেনবাবুর মধ্যে সবসময় দুটি বিপরীত ভাবের মানসিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে জ্ঞান-যুক্তি বুদ্ধির পরাকাষ্ঠায়, পরিণত মনমেজাজ, ফলে ভিড়কে ভয় পাওয়া এবং পরিণাম বিচ্ছিন্নতা। এবং অন্যদিকে সাবিত্রীর মৃত্যু যখন প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তার বিবেকদংশন করল। ভিত নেড়ে দিয়ে গেল। তখন দাম্ভিকতার খোলস থেকে বেরোতে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে নিজেকে সম্পূর্ণতা দিতে চাইলেন। তাই জীবনের এক একটি স্তর অতিক্রম করে তার বুদ্ধিবাদী দাম্ভিকতার মুখোশ খুলে গেল। কারণ তিনিই উপলব্ধি করেন মানুষ নিরালম্ব হয়ে থাকতে পারে না, তিনিও পারলেন না। প্রথমে অবলম্বন করলেন রমলাকে। কিন্তু এখানেও সম্পূর্ণতা পেলেন না। পরবর্তী পর্যায়ে সফীকের সান্নিধ্যে সমাজ-সচেতনতা ও যুগসচেতনতার স্পর্শে তিনি বৃহত্তর জনমুখী আন্দোলনের পথে নিজেকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার পথে অবতরণ করলেন। নিষ্কর্ম বুদ্ধিবাদী, কর্মের পথে যাত্রা করলেন।

রমলা দেবী আধুনিকা। স্বেচ্ছায় স্বামী পরিত্যাগ করে একাকী বাস করেন। এই রমলা দেবী কিন্তু সাবিত্রীর মৃত্যুর ফলেই শুধু খগেনবাবুর কাছে আসেনি। এর পথ সে নিজেই তৈরি করেছিল। যা প্রকাশিত হয় কাশীতে সুজনের কাছে। তিনি একটি সঙ্গীত আসরে খগেনবাবুর প্রতি মুগ্ধ হন। তারপর সাবিত্রীর সঙ্গে ভাব করেন খগেনবাবুর নৈকট্য লাভের জন্যই। এখানে রমলা দেবীকে মোটেই স্বমহিমান্বিত ভালমানুষ বা আধুনিক স্বাবলম্বী নারী ভাবা যায় না। খগেনবাবুর প্রতি আকর্ষণেই সাবিত্রী এবং খগেনবাবুর মধ্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টিকারী। আভাসে, ইঙ্গিতে সাবিত্রীর মৃত্যুর কারণ যা স্পষ্ট হয়, সেখানেও কিছুটা রমলা দেবীই দায়ী। রমলা দেবীর আধুনিকতা বহিরঙ্গেই ছিল, মননে তিনি আধুনিক হতে পারেননি। তাই খগেনবাবুর ইতিবাচক ইঙ্গিত পেয়ে তাঁর দুর্নিবার প্রবৃত্তির খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে। রমলা দেবী নিজেকে আধুনিকতার মেকি প্রলেপে শুধু রঙ দিয়ে ঢেকেছিলেন। আধুনিক মেজাজে নিজেকে গড়তে

পারেননি। তাই খগেনবাবুর এক হ্যাঁচকা টানে মুখোশ গেল টুটে। বেরিয়ে পড়ল মূর্তি থেকে খড়মাটি। তাই আবর্ত হয়ে মোহানাতে লঘু চিত্ত বিনোদনে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তিনি খগেনবাবুর সহধর্মিনী হতে পারলেন না। তথাকথিত অভিজাত আধুনিক মোহে আচ্ছন্ন নারীর অন্তঃসারশূন্য দিকটিই যেন রমলার ক্রমপরিণতিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কারণ প্রকৃত আধুনিকতা হল মনন-চেতনা-জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে মেকি আধুনিকতা পার্টি, ক্লাব, আধুনিক পোষাক-আষাক, সাজসজ্জার বহির্মুখিনতার দিকটি রমলার মধ্যে দেখা গেল।

সুজন সুশিক্ষিত বুদ্ধি-ভদ্রতা-ধৈর্য-সংযমে ভারসাম্য তার আছে। কোনও কিছুতে অত্যধিক উগ্রতা দাম্ভিকতা তার চরিত্রে নেই। সে ধনাঢ্য মামার ভাগ্নে, বাবা মা নেই। তাই পরাশ্রয়ী। সুজন রমলা দেবী ও খগেনবাবুর মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু মানবিক ও সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে সেও অগ্রাহ্য করতে পারেনি। কাশীর অক্ষয়ের বাড়িতে রমলার নিভৃত স্পর্শে, নৈকট্যে তার রমলাদি তার কাছে হয়ে উঠল শুধু এক নারী। আর রমলার কোমল স্পর্শে বহিরঙ্গে ধৈর্য-সংযম বজায় রাখলেও প্রত্যাখ্যানে অন্তর চৌচির হয়ে গেল। এতদিনকার নিজের উপর আত্মবিশ্বাসের মুখোশ খুলে পড়ল। তাই এই অবস্থায় বিজনের উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করে তাকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠায়।

বিজন চরিত্রে প্রকটিত হয়েছে তৎকালীন ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারের কিছু যুবকদের উদ্দেশ্যহীনভাবে শৌখিনতায় সোসিয়ালিস্ট হওয়ার প্রবণতা। অপরিণত জ্ঞানে যৌবনের উদ্দীপনায়, খেয়ালে দেশের গুরুতর একটি সমস্যাকে না বুঝেই লাফালাফি করা। যারা দারিদ্র্যকে উপলব্ধি করেনি, ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করেনি, জীবিকার অন্বেষণে পথে পথে হাঁটতে হয়নি যাদের তারা কেমন করে বিরোধের মর্ম বুঝবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিজের অধিকার আদায়ে প্রতিরোধের অস্ত্র হবে। তাই বিজনদের মতো কিছু অপরিণত খেয়ালী যুবকরাই যে কখনও না বুঝে ফাঁকা আদর্শে পার্টির বিপর্যয় ডেকে আনে। অপ্রত্যক্ষভাবে দল-বিরোধী বা গুপ্তচরবৃত্তির সুযোগ করে দেয়। আর একদিন চাকরি ছাড়ার মতো দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে সংকুচিত হয় না। আপন দুনিয়ায় আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শখে মজে যায়। বিজন চরিত্রের মাধ্যমে সেই যুবকবৃন্দের মুখোশই লেখক উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন।

আর দরিদ্রের সন্তান, জাত-শ্রমিক, মেহনতি, সক্রিয় কর্মী সফীক। মনপ্রাণ দিয়ে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের প্রতিনিধি যারা বিপ্লবকে ও দেশকে ভালবেসে সংগ্রামে রত হয় তাদেরই প্রতিনিধি সফীক। আর

নির্বোধভাবে ধনীর দুলাল বিজন বিশ্বাসঘাতকতা করে খুনের মামলায় পুলিশে খবর দিয়ে প্রকৃত সোসিয়ালিস্ট, কর্মী, নেতা সফীকের বিপর্যয় ডেকে আনে। মনুষ্যসর্বস্ব ধর্মই মার্কসিজম : এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী খগেনবাবু সফীকের কর্মনিষ্ঠায়, একাগ্রতায়, সাহসে প্রকৃত বিপ্লব ও মানুষের স্বার্থে লড়াইয়ে তা উপলব্ধি করেছিলেন। করেছিলেন বলেই আত্মঅন্বেষণে, দেশভ্রমণে, বৌদ্ধিক চর্চায়, রমলার সান্নিধ্যে যে সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা এবং মুক্তির পথ খুঁজে পাননি, তা সফীকের সান্নিধ্যেই সম্ভব হল। মোহানার আপাত সমাপ্তিতে এই ইঙ্গিতই সূচিত হল মনে হয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ। এই চিন্তাবিদের হাতে যখন উপন্যাস রচিত হয়, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল ব্যতিক্রমী উপন্যাস-ভাবনা। প্রথমেই উপন্যাসের আঙ্গিকে দেখা গেল নব্যরীতির সূচনাতে চেতনাপ্রবাহী রীতির উন্মোচন। সাহিত্যে image কে বাদ দিয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করলেন। বিষয়বিন্যাসে গল্প বা ঘটনা নয় বরং চরিত্রগুলির চিন্তাশীল প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল। উপন্যাস ত্রয়ী সংলাপ নির্ভরতায়, প্রবন্ধধর্মিতায় এবং কিছুটা হাস্যরস উদ্রেকে ও কাব্যিক মেজাজের আমেজে বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছে। প্রধান চরিত্রের অবচেতনে মনের প্রতিক্রিয়ায় একজন বুদ্ধিজীবীর আত্মিক দ্বন্দ্ব উদ্ভাসিত হয়েছে। আবার অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সূক্ষ্ম-জটিল-মানবিক সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি প্রকটিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিচারে লেখক মনে হয় ত্রিশের দশকের দাম্ভিক বুদ্ধিবাদ এবং অন্তঃসারশূন্য আধুনিকতাকে নস্যাৎ করতে চাইলেন। এবং দেশপ্রেমের নামে সারশূন্য আদর্শে, খেয়ালি মেজাজে উদ্বুদ্ধ যুবকদের সতর্কবাণী কর্ণে ধাবিত হল। মূলত শিল্প, সাহিত্য, জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতার তাৎপর্যে এবং প্রতীত বিশ্বাস বা ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সাহিত্যের মধ্যে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের ভাবনায় স্পষ্ট হয় উপন্যাস রচনার মূল সারসত্যের কথাটি, —

> *"এ যুগের জীবন বিচিত্র, সমৃদ্ধ, তাই unity-র আজ কোন খাতির নেই। counter point -এর মতো প্রধান-অপ্রধান জুড়ে যেতে পারে, এখানকার আর্টে সুতো জড়িয়ে গেলে সর্বনাশ হয় না, সমালোচকও বিচলিত হন না। সবটা মিলে অখণ্ড কিছু উপভোগ্য হলেই হ'ল, যেমন Joyce-এর ulysis-এ হয়েছে।"*[৫২]

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, রচনাশৈলীর নতুনত্বে, নিজস্ব ঔপন্যাসিক ভাষা সৃষ্টিতে, এবং কিছু মননঋদ্ধ,

দার্শনিকসুলভ শব্দ-চয়নে নিজস্ব একটি ঘরানা তৈরি করলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। আর এটি হয়ে উঠল প্রথাগত সমস্ত ধারণা ও বৈশিষ্ট্যের বিপ্রতীপে সাহিত্যিক সন্দর্ভের ভাবাদর্শগত প্রতিসন্দর্ভ। কারণ তিনি শুধু উপন্যাসই নয় উপন্যাসের মধ্যেই উপন্যাসের শৈলীভাবনা, বিষয়ভাবনা ও তার স্বতন্ত্র মৌলিক রূপ-গঠনের দিকও নির্দেশ করলেন। তাই এই ত্রয়ী সচেতন পাঠকমহলে সীমিত থাকলেও এক অনবদ্য সৃষ্টি রূপেই গণ্য হয়। কারণ তিনি বিচিত্র যুগ-জীবনের শৈল্পিক প্রতিবেদন নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, পৃঃ ৫২

২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, নিবেদন অংশ, পৃঃ ৯

৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, টেরি ঈগলটন ও তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১৩, পৃঃ ১৫৮

৪. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, পৃঃ ১৩৪

৫. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭ (বক্তব্য), পৃঃ ১১৯

৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ৩য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭, (ঝিলিমিলি) পৃঃ ২৫১

৭. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, (রিয়ালিস্ট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ) পৃঃ ২১

৮. তদেব, পৃঃ ১৩৪

৯. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭, (চিন্তয়সি) পৃঃ ৬

১০. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ৩য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭, (ঝিলিমিলি) পৃঃ ২১৭, ২১৮

১১. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭, (বক্তব্য, অথ কাব্য জিজ্ঞাসা) পৃঃ ১৬৪, ১৬৫

১২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, (বয়ান-ই তহরিরি- পরিশিষ্ট) পৃঃ ৪৪৮, ৪৪৯

১৩. তদেব, (পরিশিষ্ট) পৃঃ ৪২১

১৪. সুব্রত রায়চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রসঙ্গ ত্রিদিবা, ওয়ানটাচ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৪, গৃহীত সংস্করণ ১৯৯৭, (উদ্ধৃত) পৃঃ ৯০

১৫. তদেব, (উদ্ধৃত) পৃঃ ৯২

১৬. ড. শৈলেশ বিশ্বাস, গোপাল হালদার কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, গৃহীত সংস্করণ ২০০১, (উদ্ধৃত) পৃঃ ১২০

১৭. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, (পরিশিষ্ট) পৃঃ ৪৪০

১৮. তদেব, (বয়ান-ই তহরিরি- পরিশিষ্ট) পৃঃ ৪৪৮

১৯. তদেব, পৃঃ ৪৪৯

২০. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭, (বক্তব্য - বর্তমান সাহিত্যের মূল কথা) পৃঃ ১২৪

২১. Thomas Mann, The magic mountain Vol-II, Trans. H. T. Lowe porter, 1927, page-683

২২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, পৃঃ ১৫২

২৩. তদেব, পৃঃ ৭৪

২৪. তদেব, পৃঃ ৭৪

২৫. তদেব, পৃঃ ৭৬

২৬. তদেব, পৃঃ ৮৪

২৭. তদেব, পৃঃ ৫১০

২৮. তদেব, পৃঃ ১৪৫, ১৮০, ১৯১

২৯. তদেব, পৃঃ ২০০

৩০. তদেব, পৃঃ ১৯৭

৩১. তদেব, পৃঃ ১৯৮

৩২. তদেব, পৃঃ ২০৩

৩৩. তদেব, পৃঃ ২১১

৩৪. তদেব, পৃঃ ৮১

৩৫. তদেব, পৃঃ ২২৫

৩৬. তদেব, পৃঃ ২২৮

৩৭. তদেব, পৃঃ ২৩৮

৩৮. তদেব, পৃঃ ২৩৯

৩৯. তদেব, পৃঃ ২৬৪, ২৬৫

৪০. তদেব, পৃঃ ৩০০

৪১. তদেব, পৃঃ ২৯০

৪২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ১৯৮৭, (আমরা ও তাঁহারা) পৃঃ ৮১, ৮২

৪৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০১১, পৃঃ ৩০৫

৪৪. তদেব, পৃঃ ৪১২, ৪১৩

৪৫. তদেব, (পরিশিষ্ট- নিবেদন অংশ) পৃঃ ৪৩৭

৪৬. তদেব, পৃঃ ১১৯

৪৭. তদেব, পৃঃ ১৩৯

৪৮. তদেব, পৃঃ ১২৩

৪৯. তদেব, পৃঃ ১৫০

৫০. তদেব, পৃঃ ১৭১

৫১. তদেব, পৃঃ ২২৮

৫২. তদেব, পৃঃ ১৭৫